আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭

শহীদ দিবস
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২০১৭

MARTYRS' DAY

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2017

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৫ মার্চ ২০০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

শহীদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭

ফে ব্রু য়া রি

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭

স্মরণিকা

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শহীদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭

প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ | ৯ ফাল্গুন ১৪২৩

সম্পাদক : অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী
নির্বাহী সম্পাদক : শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম

স্মরণিকা উপকমিটি

১. শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	আহ্বায়ক
২. বেগম আকতার কামাল, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩. অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪. জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫. জনাব মোঃ আবু রায়হান মিঞা, উপপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৬. সাজিয়া আফরীন, সিনিয়র সহকারী সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. জনাব মোঃ বাকী বিল্লাহ, সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮. ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, সহকারী পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	সদস্যসচিব

স্বত্ব: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ: আইডিয়া প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা ১০০০

আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ : শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় তিনজন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

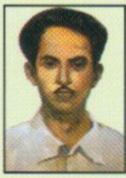

শফিউর রহমান : ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বলে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা সম্ভব হয়।

আবদুল জব্বার : শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায়। প্রায় বারো বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। শহীদ আবদুল জব্বারের পাকিস্তানের প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাহিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে যারা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

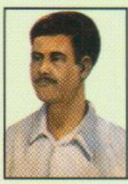

আবদুস সালাম : শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর চাকরির সন্ধানে ঢাকা এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র-জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্তানে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল আউয়াল : শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ২৬ বছর। পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলা ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড।

অহিউল্লাহ : শহীদ অহিউল্লাহ ৮/৯ বছরের বালক। অহিউল্লাহর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশায় রাজমিস্ত্রী। ১৩৬২ সনের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তাঁর মাথায়। পুলিশ অতি দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয় এবং গায়েব করে দেয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪২৩
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি বাংলাভাষীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মাতৃভাষার দাবীতে সোচ্চার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সৈনিককে, যাঁদের অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। এরই ধারাবাহিকতায় নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের বড় অর্জন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতিসংঘ এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Towards Sustainable Futures through Multilingual Education", যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জন করা সহজতর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অমর একুশের চেতনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আমাদের শহীদ দিবস এখন বিশ্বজুড়ে নিজস্ব ভাষা ও স্বকীয়তা রক্ষার চেতনার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব – মহান ভাষা দিবসে এই কামনা করি।

মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় ঐক্য ও বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠুক–এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪২৩
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এদিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে।

আজকের এ দিনে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জাতির পিতা। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। ঐ বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ই জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯শে এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহীদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ৮ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়নে কাজ করি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখি। সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'।

আমি সকল ভাষা শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে যুগপৎ শোক ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার ও শফিউর-সহ আরও অনেকে। আজকের এ দিনে আমি তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভাষা আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। একইসঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর শহীদদের জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তস্নাত গৌরবগাথা ও এর মর্মবাণী আজ বিশ্বের ১৯৩টিরও অধিক দেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বিশ্বের সকল মাতৃভাষার গবেষণা, ভাষা-সংরক্ষণ ও ভাষার প্রমিতায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সানুগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলা বিশ্বের প্রায় ২৫ কোটি মানুষের মুখের ভাষা। ভাষিক সংখ্যা বিচারে বাংলা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার জাতিসংঘের অন্যতম সরকারিভাষা হিসেবে 'বাংলা'কে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অবদান বিশ্বের মাতৃভাষা রক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইউনেস্কো এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে *Towards Sustainable Futures Through Multilingual Education*। বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তর আনতে সরকার ইতোমধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে কাজ শুরু করেছে। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধা, দারিদ্র, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতামুক্ত এবং আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকার এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এ জন্য 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করা হয়েছে। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সম-অবস্থান ও মর্যাদা লাভ করব।

আজকের এ দিনে আবারও আমি সকল ভাষাশহীদসহ বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা ও মানুষের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং ভাষা-আশ্রয়ী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সংগ্রাম করছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা। *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* ২০১৭ পালন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

MINISTER

Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh

Message

I am happy to learn that the International Mother Language Institute (IMLI) is going to bring out a publication on the occasion of the International Mother Language Day 2017.

With deep reverence, I recall our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under whose charismatic leadership Bengali people waged a systematic struggle for independence from 1947 to 1971 which culminated in an independent Bangladesh following a glorious Liberation War. Language movement was the beginning point of our struggle for self-determination. I recall with deep respect all language martyrs including Rafiq, Salam, Barkat, Jabbar who laid down their lives to establish the inalienable right of the Bangla speaking people to protect and speak their mother tongue.

As a matter of fact, this supreme sacrifice of the language martyrs established the right of all the peoples of the world to speak and protect their mother tongue. Soon after independence, Bangabandhu established Bangla as our state language in 1972 and then on 25 September 1974 at the 29th session of the General Assembly of the United Nations, he delivered his maiden speech in Bangla and thus introduced Bangla anew to the world.

Our pride "Amar Ekushey" or "Mother Language Day" received a huge recognition when during the first tenure of Bangabandhu's daughter and Prime Minister Sheikh Hasina, in 1999, the UNESCO declared it as 'International Mother Language Day'. The Day is now observed all over the world not only to commemorate the sacrifice of the language martyrs of Bangladesh but also to encourage every citizen of the world to continue nurturing their mother tongue. I am happy to know that UNESCO will celebrate International Mother Language Day 2017 on the theme "Towards Sustainable Futures through Multilingual Education." The Day will be in line with "Education for People and the Planet : Creating Sustainable Futures for All", theme of UNESCO's Global Monitoring Report on Education, 2016.

Many languages are becoming vulnerable and on the verge of extinction due to change in life style and usage by people. We should try to protect and patronize the smaller language to maintain the linguistic diversity. On this day, I congratulate all the different linguistic nationalities around the world and urge them to nurture their mother tongue and bequeath the legacy to their next generation.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.

(Abul Hassan Mahmood Ali, M.P.)

Director-General

UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Message

On the occasion of International Mother Language Day

21 February 2017

On the occasion of International Mother Language Day, UNESCO restates its wholehearted commitment to linguistic diversity and multilingualism. Languages express who we are, they structure our thoughts and identities. There can be no authentic dialogue or effective international cooperation without respect for linguistic diversity, which opens up true understanding of every culture. Access to the diversity of languages can awaken the curiosity and mutual understanding of peoples. That is why learning languages is at one and the same time a promise of peace, of innovation and of creativity.

International Mother Language Day, devoted this year to multilingual education, is also an opportunity to mobilize for the Sustainable Development Goals, and in particular SDG 4, to ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. Education and information in the mother language is absolutely essential to improving learning and developing confidence and self-esteem, which are among the most powerful engines of development.

We are beings of language. Cultures, ideas, feelings and even aspirations for a better world come to us first and foremost in a specific language, with specific words. These languages convey values and visions of the world that enrich humanity. Giving value to these languages opens up the range of possible futures, and strengthens the energy needed to achieve them. On the occasion of this Day, I launch an appeal for the potential of multilingual education to be acknowledged everywhere, in education and administrative systems, in cultural expressions and the media, cyberspace and trade. The better we understand how to value languages, the more tools we will have to build a future of dignity for all.

Irina Bokova

(Irina Bokova)

মুখ্যসচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ও
বাংলাদেশ প্রতিনিধি, ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ড

বাণী

ফাল্গুনের রক্তঝাউ পরে আছে বসন্তের জামা
আমি তার এক হাতা পরে অন্য অংশ দিয়েছি ভাইকে
ভাই বোনকে দিয়েছে তার সবগুলো সবুজ বোতাম
আর সুতো
আমরা সবাই মিলে ভাগ করে পেয়ে গেছি একটি পতাকা।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

একুশে আমাদের গর্ব, আমাদের চেতনার বাতিঘর, আমাদের ভাষাপ্রেমের অনন্য স্মারক। আমরা জানি, ভাষার মৃত্যু মানে সভ্যতার মৃত্যু। ভাষার মৃত্যু মানে একটি জাতিগোষ্ঠীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু। কোনো একটি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যায় তারা যত অল্প বা ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার মাতৃভাষা যেন যথাযথ মর্যাদা পায়– এটা যেমন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি চরম অস্তিত্ব বিপন্নতার সম্মুখীন ভাষাটিও যেন সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকে, সেজন্যও আমাদের সম্মিলিত ভূমিকা প্রত্যাশিত।

বস্তুত এই মৌল লক্ষ্যে, বিশেষ করে মাতৃভাষায় গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ ও ভাষার প্রমিতায়নের অঙ্গীকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করেছে। এ অর্জন আমাদের জন্য এক বিরল গৌরব। একইসঙ্গে তা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট– এর ওপর অর্পিত কর্মযজ্ঞ আরও সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হবে।

আজকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা, স্বাধিকারসচেতন বাঙালির সকল আন্দোলন-সংগ্রামের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার-সহ ভাষার জন্য প্রাণদানকারী শহীদদের।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ পালনার্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের, যাঁরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান কালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী বাঙালি তরুণদের সেদিনের প্রাণদান বৃথা যায়নি, বাঙালির 'একুশে' আজ স্থান করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। সারা পৃথিবীর মানুষ যথাযথ মর্যাদায় আজ এ দিবসটি পালন করছে। মাতৃভাষার অপমান ও অবদমন রুখে দাঁড়াতে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ও উদ্যোগের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার বিকাশ সাধন ও মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বের সকল মাতৃভাষার গবেষণা, ভাষাসংরক্ষণ ও ভাষার প্রমিতায়নে এ ইনস্টিটিউট অঙ্গীকারাবদ্ধ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্পাদন করে চলেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ, ফলপ্রসূভাবে দৃশ্যমান হতে সময় লাগবে। আশা করি, এসব বাস্তবায়িত হলে আমরা সকলেই উপকৃত হবো।

ইউনেস্কো এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্দিষ্ট করেছে– *Towards Sustainable Futures Through Multilingual Education*। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন কর্মসূচি-প্রকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়িত হলে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি আমরা শিক্ষিত ও অগ্রসর জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। এ জন্য আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বাংলাদেশের বাঙালিরা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষাপ্রেমীদের স্বপ্ন-সাধ কালক্রমে নিশ্চয়ই পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ পালন-উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য প্রত্যাশি করছি।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি *মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* উপলক্ষে বাংলাভাষীসহ পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব তথা মাতৃভাষা বাংলার অধিকার রক্ষার প্রথম রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। এ আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মানুষকেই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালির হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত এরই পথ ধরে এগিয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বিদ্রোহ-বিক্ষোভ; যার চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ৯-মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আজকের এই মহতী লগ্নে আমি ভাষাশহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। সেইসঙ্গে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের স্বাধীনতার মহান রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জানাচ্ছি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। মাতৃভাষা বাংলার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সেদিন তাঁরও ছিল অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদান।

১৯৯৯ সালে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম (বর্তমানে প্রয়াত)-সহ কয়েকজন বাঙালি ও বিদেশির যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত 'মাতৃভাষার প্রেমিকগোষ্ঠী' নামক সংগঠনের প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি লাভ করে। এ আমাদের জন্য এক বিরল গৌরব ও সম্মানের বিষয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে, বিশেষ করে বিশ্বের সকল মাতৃভাষাসংক্রান্ত গবেষণা কাজ পরিচালনা, ভাষার সংরক্ষণ ও প্রমিতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ২০১৬ সালে এ ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি ২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। ফলে আমি মনে করি, এ ইনস্টিটিউটের কর্মপরিধি এখন আরও বিস্তৃত হয়েছে। আশা করছি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সেলক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ পালনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যেসকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আলমগীর)

শহীদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭

Head and Representative

UNESCO Office, Dhaka

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Message

With the strong initiative of Bangladesh, International Mother Language Day (IMLD) was proclaimed by UNESCO in 1999. IMLD is a worldwide annual observance held on 21 February to promote awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism. The United Nations calls on its member states to "promote the preservation and protection of all languages used by people of the world" following international understanding through multilingualism and multiculturalism.

To strengthen the message each year a different theme is the area of focus. In 2017, the theme of International Mother Language Day is **"Towards Sustainable Futures through Multilingual Education"**.

As Irina Bokova, Director-General of UNESCO reminds us, 'this is also an opportunity to mobilize for the Sustainable Development Goals, and in particular SDG 4, to ensure inclusive and quality Education for all and promote life long learning. Education and information in the mother language is absolutely essential to improving learning and developing confidence and self-esteem, which are among the most powerful engines of development.'

With its mandate in education, UNESCO attaches great attention and focus on all aspects of education as a human right for all throughout life and that access must be matched by quality. This includes education in mother language and multilingual education.

In this context, UNESCO highly values the initiative and commitment of the Government of Bangladesh, in not only having established the International Mother Language Institute (IMLI) in Dhaka, but since November 2015 having it under the auspices of UNESCO as a UNESCO Category 2 Institute with the objective to promote the right to education, linguistic diversity, cultural pluralism and understanding. In this new role, IMLI is starting to emerge as an on-going platform and infinite source of promotional activities of mother language and multilingual education for the region and beyond.

UNESCO greatly appreciates the efforts of IMLI to observe the International Mother Language Day 2017 through five-day inter-connected events including an opening ceremony, an international seminar on "Language Documentation and Multilingual Education", a national seminar on "Bangla Dialect of Bangladesh : Collection and Preservation", children's art competition and a cultural function.

UNESCO and the UNESCO Office in Dhaka wish to congratulate the Government of Bangladesh and IMLI in their efforts, not only for the 21 February, but throughout the year. We express also our commitment to support you in this journey.

(Beatrice Kaldun)

মহাপরিচালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

বাণী

মানব-অস্তিত্ব ও মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক ছায়া ও কায়ার মতো। ভাষিক পরিচয়ে বিশ্ববাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত কিন্তু তা নিতান্তই বহিরাঙ্গিক। রঙধনু যেমন তার রঙের বৈচিত্র্যের জন্য মনোহর, বিশ্বভূগোল অনুরূপভাবে জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যান্বিত। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই রয়েছে অভিন্নতার বোধ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সংহতি-চেতনাকে কখনো-কখনো মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রদায় বিশেষের আধিপত্য ও আগ্রাসী মনোভাব এই ধরিত্রীকে বিদ্ধ ও সংরক্ত করেছে। কিন্তু কোনো আগ্রাসন, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ করে অন্যের পরিচয় মুছে ফেলতে পারেনি। শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে স্বাতন্ত্র্যকামী মানুষ, সংরক্ষিত হয়েছে তার নিজস্ব পরিচয় ও স্বকীয়তা।

পূর্ববাংলাবাসীর প্রত্যাশা ১৯৪৭-এর মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই ভঙ্গ হয়। পাকিস্তানি শাসকচক্র এ দেশবাসীর মানবিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার মুছে ফেলার দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। খাল-নদী-জলা ও জঙ্গলের এ পললভূমির অধিবাসীরা সর্বকালেই আত্মমগ্ন ও শান্তিপ্রিয়। কোনো কিছুই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেই তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী, আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাদীপ্ত। তাদের এ সংগ্রামকে সুসংগঠিত, সুতীব্র ও লক্ষ্যভেদী করে তুলতে সেদিন যাঁরা নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা বায়ান্ন-পরবর্তী সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে লাভ করেছি স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্র।

মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষার জন্য এ জাতি যে করুণ ও বেদনার্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা যেন কোনো ভাষিক সম্প্রদায়কে স্পর্শ না করে– এই মর্মবাণী বিশ্বে প্রসারিত হোক– আমরা অনেকেই তা স্থানীয়ভাবে প্রত্যাশা করেছি। কানাডা-প্রবাসী বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম সেই আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে চিঠি লেখেন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানকে, আহ্বান জানান অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার। সে-প্রত্যাশা সফল হয় তৎকালীন সরকার প্রধান, বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার ত্বরিত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক উদ্যোগের ফলে। তাঁর অবদান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে।

ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা (১৭ নভেম্বর ১৯৯৯)-র পরে পল্টন ময়দানের লাখো জনতার সমাবেশে তিনি, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দেন।' তিনি কফি আনানের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সে-অনুযায়ী এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু তা অব্যাহত থাকেনি, সরকার পরিবর্তনের পর তা পরিত্যক্ত হয়। সে-কাজ বাস্তবায়িত হয় তখনই যখন তিনি দ্বিতীয়বার সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধনসহ আইন প্রণয়ন এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়েই এ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি ২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পাঁচ-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। এ আয়োজন সম্পাদনে আমরা সকলের সহযোগিতা প্রতাশা করছি।

(জীনাত ইমতিয়াজ আলী)

ভালোবাসি মাতৃভাষা

শেখ হাসিনা*

‘মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা...’

আমার ভাষা, মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা।
জন্মেই মাকে ‘মা’ বলে ডাকি। মায়ের মুখের ভাষা থেকে বলতে শিখি। মনের কথা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করি। যে ভাষায় আমি সব থেকে ভালো বুঝতে পারি সে আমার মায়ের ভাষা। ভালোবাসি ভালোবাসি মাতৃভাষা ভালোবাসি। সকল ভাষার সেরা ভাষা মাতৃভাষা মাতৃভাষা। ভালোবাসি মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা আমার ভাষা।

সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মায়ের ভাষাকে ভালোবাসে। মায়ের ভাষা দিয়ে সব ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না হৃদয়জুড়ে সবটুকু বলা মায়ের ভাষায়। এর থেকে সুন্দর, এর থেকে মধুর আর কী হতে পারে?

মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে রক্ত দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে।

‘মা’ বলে ডাকার অধিকার আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। পারেনি কারণ এ ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্ত ঝরাতে হয়েছে, বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিতে হয়েছে মায়ের ভাষায় মাকে ‘মা’ বলে ডাকব। এ আমার প্রাণের অধিকার। এ আমার অস্তিত্বের অধিকার। আমার জাতিসত্তার অধিকার। ২১ ফেব্রুয়ারি এমনি একটি রক্তঝরা দিন। ১৯৫২ সালে এ দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর আরও কত নাম না জানা ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে লিখে গেল ভালোবাসি মাতৃভাষা। সে থেকে তো আমরা মাকে ‘মা’ বলে পরানভরে ডাকতে পারলাম।

এ বিশাল পৃথিবীর এক কোণে বঙ্গোপসাগরের তীরে ছোট একটি ভূখণ্ডের মানুষ সেদিন কী সাহস দেখিয়েছে! মাতৃভাষাকে ভালোবেসে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আত্মত্যাগ

*মননশীল প্রবন্ধ লেখক ও রাজনীতিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

করেছে, সে কথা স্মরণ করে প্রতি বছর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বাংলার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা বংশপরম্পরায়। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, শহীদ স্মৃতি অমর হোক। না, শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি।

এ আত্মত্যাগের শিক্ষা নিয়েই তো ভালোবেসেছি দেশকে। লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পেয়েছি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমার দেশ তোমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

শহীদের আত্মত্যাগের স্মৃতি আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। বিশ্বসভায় আজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকৃতির জন্য। আর এ স্বীকৃতি বাঙালিই প্রথম বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিল তার সাহসের কথা। বাঙালিই প্রথম দেখাল এ অর্জনের পথ।

২১ ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু আমাদের একার নয়। সমগ্র বিশ্ব আজ এ দিনটি স্মরণ করবে। ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে, স্মরণ করবে এ দিবসের অমর শহীদদের। আবিষ্ট হবে এ দিবসের তাৎপর্য শুনে, শুধুমাত্র মায়ের ভাষাকে বাঁচাতে একটি জাতি কী অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে গর্জে উঠেছিল এক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর যখন ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হবে সকলে অনুপ্রেরণা পাবে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে বাঙালি জাতি বীরের জাতি, ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ঠিক যেমন রক্ত দিয়েছিল মেহনতি শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য আদায় করতে ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে। আমরা ১ মে শ্রমিক দিবসে আজও তাদের স্মরণ করি।

'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়...।'
১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তান নামের দেশটির আবার দুটো খণ্ড। একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর একটি পূর্ব পাকিস্তান। দুই ভূখণ্ডের মাঝে দূরত্ব ১,২০০ মাইল। প্রায় ১,৮৫২ কিলোমিটার। পূর্ব পাকিস্তান নামের অংশটির অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী, মূল ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলাভাষা।

পাকিস্তান নামের দেশটির এ পূর্ব খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নামে প্রদত্ত বাংলার মানুষ তখন গোটা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগ বাঙালি।

বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবহাওয়া, জলবায়ু ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার জীবনাচরণ সবই আলাদা। শুধুমাত্র একটিই মিল, তা হলো ধর্ম। এ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র ধর্মের নামে ১,২০০ মাইল দূরের দুটো ভূখণ্ড নিয়ে একটি দেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি বৈষম্যের শিকার হতো। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর ছয় মাস পার হবার আগেই শুরু হলো ষড়যন্ত্র। করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সে শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। করাচির শিক্ষা সম্মেলনের খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর চিফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটিই প্রথম বিক্ষোভ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জিন্নাহর ছবি সরিয়ে ফেলে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) জন্ম হয়। মাতৃভাষার মর্যাদার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মজলিশ নামে অপর সংগঠন একত্র হয় মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক ফতোয়া দিলেন যে, উর্দু হলো ইসলামের ভাষা আর হিন্দুদের ভাষা হলো বাংলা, কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হতে হবে।

অথচ পাকিস্তানে আরও অনেক প্রদেশ রয়েছে, ভাষা রয়েছে। পাঞ্জাব দুই খণ্ডে বিভক্ত, পাকিস্তানে এক অংশ আর ভারতে আরেক অংশ। উভয় খণ্ডে পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ব্যবহার করে।

উর্দু কোনো জাতির মাতৃভাষা নয়। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচ-সহ আরও অনেক মাতৃভাষা পাকিস্তানে রয়েছে।

আর বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে মাতৃভাষার ওপর চরম আঘাত হানার চেষ্টা বাঙালিরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকেই যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাই হতো রাষ্ট্রভাষা। অথচ যে ভাষায় মাকে 'মা' বলে ডাকি, যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা কেড়ে নেওয়ার এক নির্মম ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এ ষড়যন্ত্র বাঙালিরা কোনোদিনই মেনে নিতে পারে না। মেনে নেবে না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালি বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। বাংলার মানুষ এ ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকারের এ হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অগ্রণী ভূমিকা নেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন।

২ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক মুসলিম হলে। এ বৈঠকেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাংলার জনগণকে মুসলিম সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। বিভিন্ন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে।

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। বাঙালির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াবার জন্য এ ধর্মঘট। ১১ মার্চের ধর্মঘটের দিনে ছাত্ররা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ বিক্ষোভে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ গ্রেপ্তার যেন আগুনে ঘৃতাহুতি। বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র যখন জানতে পারে ঢাকায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিক্ষোভে তারা রাস্তায় নামে। প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে ১৫ মার্চ বন্দিদের মুসলিম লীগ সরকার মুক্তি দেয়।

জনাব নাজিমুদ্দিন তখন পূর্ব পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার। তিনি সমঝোতার উদ্যোগ নেন। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করেন ১৫ মার্চ। সংগ্রাম পরিষদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় প্রস্তাব পাশ করা হবে যে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ঘোষণার পর সকল ছাত্রবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং পুলিশের হামলার তদন্ত করা হবে। এ সমঝোতায় সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল বন্দি মুক্তি পান ১৫ মার্চ সন্ধ্যায়।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা হয় (আমতলা বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নতুন এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ে)। ১৬ মার্চে ভাষার দাবিতে যে সভা হয় সে সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। সকালে এ সভা শেষ হয়। ঐদিন বিকেলে আইন সভার অধিবেশন বসে। তখন সংসদ ভবন ছিল বর্তমান জগন্নাথ হল যে স্থানে, সেখানে। সেখানে ছাত্ররা জমায়েত হয় কিন্তু সেখানে আবার পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ক্ষেপে যায় জনাব নাজিমুদ্দিনের ওপর এবং প্রতিবাদ জানায় এ অত্যাচারের। তারা নাজিমুদ্দিনের তদন্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং পুলিশ নির্যাতনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে।

আমাদের সময়ে সকল আন্দোলনের পীঠস্থান যেমন ছিল বটতলা, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন-সংগ্রাম-মিটিংয়ের জায়গা ছিল আমতলা। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ যেখানে, ঠিক সে স্থানে।

সে আমতলায় ১৬ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সাথে জনতাও এসে যোগদান করে। পুলিশ সেখানে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বাধার মুখে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও

টিয়ারগ্যাস মেরে সভায় হামলা চালায়। সে হামলার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলন নতুন গতি পায়।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকায় এলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার প্রথম সফর এ ভূখণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। তাকে বলা হতো 'কায়েদে আযম' অর্থাৎ পাকিস্তানের জাতির জনক। সে পাকিস্তানের জাতির জনক পাকিস্তানের এ ভূখণ্ডে এলে তাকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। জিন্নাহকে সংবর্ধনা দেবার জন্য তৎকালীন রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক সভা হয়। বিশাল জনসভা, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণ এসেছে কায়েদে আযম অর্থাৎ জাতির পিতাকে দেখতে, তার কথা শুনতে। কিন্তু সে জনসভায় তিনি ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। আর তখনই ছাত্ররা জনসভার মধ্যেই প্রতিবাদ করল। জনসভায় এ প্রতিবাদ শুনে তিনি একদম চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা বন্ধ করে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলেননি। এরপর তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু করেন। অবশ্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং বন্দি করে রাখে যতক্ষণ সমাবর্তন শেষ না হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে', এ কথা ইংরেজি ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করার সাথে সাথে সমাবর্তনের উপস্থিত ছাত্ররা 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ জানায়। ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রইল। ১১ মার্চ এরপর থেকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হতে থাকল প্রতিবছর। তার এ ঘোষণায় সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কয়েকজন ছাত্র।

১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার জন্য ২৩ জুন গঠন করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ। 'আওয়ামী' শব্দের অর্থ জনগণ। মুসলিম লীগকে সমাজে উঁচু শ্রেণির দল হিসেবে চিহ্নিত করে। জনগণের সংগঠন হিসেবে জন্ম নিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরবর্তীকালে এ দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার জন্য 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম দেওয়া হয়। ভাষার দাবি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় বঙ্গবন্ধু ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেপ্তার হন। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান অথচ মুসলিম লীগ সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেশের এ বিরাজমান খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন চলাকালে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন।

ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান।

১১ অক্টোবর নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনকে আরও বেগবান করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

খাদ্য সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে বলে খাদ্যের দাবিতে আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা ও ভুখা মিছিল বের করে আওয়ামী মুসলিম লীগ। এ মিছিল থেকে ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু-সহ অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। পরে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর ঘাতকের হাতে নিহত হন। খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রপ্রধান হন। পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিক্ষোভ দমাতে পেরে খাজা নাজিমুদ্দিন পুরস্কৃত হন। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫২ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই তিনি ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ ঘোষণায় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ করলেন। জেলে তখন বন্দি শেখ মুজিব। ঢাকা মেডিকেল কলেজে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে আনা হয় যখন এ ঘোষণা হয়। তিনি মেডিকেল কলেজে অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করার সুযোগ পান। গভীর রাতে গোপনে মিটিং হয়। আন্দোলনকে জোরদার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সঙ্গী হলেন।

যেহেতু ঢাকায় থাকলে, ছাত্রদের সঙ্গে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান তাই তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে হলে স্টিমারে যেতে হতো, স্টিমার ছাড়ত নারায়ণগঞ্জ থেকে। নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে অনেক নেতা অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। সেখানেও তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি সফল করার নির্দেশ দেন। সকলকে কাজ করার জন্য নেমে পড়তে বলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অনশন শুরু করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখানে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রাখার দায়ে বঙ্গবন্ধুকে অনশনরত অবস্থায় ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হলো।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪ টায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর মুসলিম লীগ সরকার গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার লুটিয়ে পড়ল কালো পিচঢালা পথে। তারা রক্তের অক্ষরে মায়ের ভাষায় মাকে 'মা' বলে ডাকার দাবি জানিয়ে গেল। সেই থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবছর 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

আমি ও কামাল তখন খুব ছোট। আব্বা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্দি, তারপরও খুব অসুস্থ অবস্থায় অনশন করছেন। দাদা এ খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে ঢাকায় রওনা হলেন নৌকায় করে। বেশ বড় নৌকায় আমরা দুই ভাইবোন হেঁটে-চলে বেড়াতে পারি। দুইখানা কামরা নৌকায়। টুঙ্গীপাড়া থেকে রওনা হয়ে পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ পাড়ি দিয়ে চারদিনে ঢাকা এসে পৌঁছেছি। তিন মাল্লার নৌকা তাই বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। আজিমপুর কলোনিতে আমার দাদার ছোট ভাই থাকতেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আমরা সেখানে উঠলাম। ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমি তখন ঢাকায় ছিলাম, তবে এত ছোট ছিলাম যে, সব স্মৃতি এখন মনে নেই। রাতে কার্ফু, সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডেকেছে। আজিমপুর কলোনিতে এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে কেউ যাতে অফিসে না যায় তার জন্য আহ্বান করত, আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে ধাওয়া করত। ঘরের ভেতর এক রকম বন্দি থাকতে হয়েছে। পরের দিন আব্বার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে গেছে। দাদা স্টিমারে মা, দাদী, কামাল ও আমাকে দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আর দাদা গেলেন ফরিদপুরে। আব্বাকে ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে মুক্তি দেওয়া হলো। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দাদা আব্বাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। দীর্ঘদিন অনশনে থেকে শরীরের যে ক্ষতি হয়েছিল তা সারিয়ে তুলতে তিন মাস সময় লেগেছিল। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ঢাকায় আসেন।

১৯৪৮ সাল থেকে যে আন্দোলন শুরু ১৯৫২ সালে এসে সে আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অবদানই সব থেকে বেশি। প্রগতিশীল ছাত্রসমাজও এ আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রাখে। আজ যদি বাংলার মানুষের ভাষার আন্দোলন না হতো আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতাম না।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করে জয়ী হয়। ১৯৫৫ সালে নতুন কেন্দ্রীয় আইন সভা গঠিত হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের ১২ সদস্য নতুন শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করার জন্য সংসদে সংগ্রাম শুরু করে এবং চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হলেও বার বার ষড়যন্ত্র হতে থাকে এবং স্থায়ী সরকার গঠন হতে পারে না, ভাঙাগড়ার খেলা চলতেই থাকে। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হন। শেখ মুজিব তখন মন্ত্রী হন।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেয় এবং ঐদিন সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয় এ দিবসটিকে। সেই থেকে আজও

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসাবে বাংলার মানুষ পালন করে যাচ্ছে। অওয়ামী লীগ সরকার শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকল্প গ্রহণ করে বাজেটে টাকা ধার্য করে। শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বাংলার মানুষের কপালে কোনো সুখ স্থায়ী হয় না।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মার্শাল ল' জারি হয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয় এবং নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। শহীদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন বাতিল করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। আবার দীর্ঘ আন্দোলন– ৬ দফা, ১১ দফা, ১৯৭০-এ নির্বাচন, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন, স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা লাভ– সবই রক্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। তারপরও কি ষড়যন্ত্র থেমে থেকেছে? ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি শহীদ দিবস পালন করে।

১৯৭৫ সালে ঘাতকের দল জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা, সামরিক শাসন জারি, একটির পর একটি সামরিক ক্যু, রক্তপাত, ভোটার অধিকার হরণ, গণতন্ত্র নির্বাসন।

আবার সংগ্রাম, আন্দোলন, রক্তদান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগের বিজয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

মহান ভাষা আন্দোলনে যে অবদান বাঙালি জাতি রেখেছিল তা আজ সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। এ আমাদের গৌরবের, অহঙ্কারের দিন। এদিন হৃদয়ে ঝরে রক্তক্ষরণের বেদনা, চোখে ভাসে অশ্রুধারা। মুখে আমাদের গর্বের হাসি। এ এক অদ্ভুত আনন্দ-বেদনা আর গর্বে ভরা বিচিত্র অনুভূতি– যে অনুভূতি শুধু বাংলার সীমানায় আবদ্ধ নয়, আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মহৎ অর্জন। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে কত আত্মত্যাগ। অনেক অত্যাচার নির্যাতন স্বীকার করে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভাষার মর্যাদা। আর এ ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পেয়েছি স্বাধীনতা।

কানাডায় প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি এবং কিছু বিদেশি মিলে 'মাতৃভাষার প্রেমিক গোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠন করে। এ সংগঠন প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব পাঠায়। চিঠির উত্তরে মহাসচিব জানান, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, জাতিসংঘের সদস্য ভুক্ত কোনো দেশের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে তারা বিবেচনা করতে পারে।

কানাডা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমাকে ফোনে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি জানান এবং প্রস্তাব পাঠাতে পারি কি-না তা জানতে চান।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাঠাতে বলি। প্রস্তাবে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ছিল প্রস্তাব পাঠাবার শেষ দিন। কাজেই অতি দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ করে।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহর শ্রমিক বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকরা শ্রমের মূল্য আদায়ের জন্য জীবন দান করেছিল। সারাবিশ্ব সে দিবসটি পালন করে। শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কথাও বলি। ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদস্যপদ প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক যাই। জাতিসংঘ রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করি। জাতিসংঘের মহাসচিব এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং মহাসচিবের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে শরিক হই।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জাতির অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরি। মাতৃভাষাকে আমরা কত ভালোবাসি তা গর্বভরে উল্লেখ করি।

নিউইয়র্ক থেকে আমি প্যারিস যাই ইউনেস্কো কর্তৃক শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য। ২৪ সেপ্টেম্বর আমাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইউনেস্কোর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিষয়ে আলোচনা করি। ২১ ফেব্রুয়ারির কথাও উল্লেখ করি।

ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতিভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তারা এবং প্যারিসে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৭ নভেম্বর এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি। ছয় হাজারের বেশি মাতৃভাষা রয়েছে। সঠিক সংখ্যাটি এখনও জানা যায়নি। অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার খোঁজে মানুষ তার সুবিধামতো অবস্থান নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। ফলে সহজে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে নেয়। আর তাই হারিয়ে যায় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা হওয়াতে আর মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে না, অন্তত অস্তিত্ব খুঁজে বের করা যাবে। সংরক্ষণ করা হবে, গবেষণা করা হবে।

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ছেলেমেয়েদের নিজের ভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজি অবশ্যই শিখবে, ইংরেজি ও আরবি– এ দুটো ভাষা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য এ দুটো ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে পারি কিন্তু তা অবশ্যই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা, বনানীতে ইদানীং দেখা যায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। বাংলা শিক্ষা একেবারেই দেওয়া হয় না। প্রতিটি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় আমাকে খুবই পীড়া দেয়। সেটি ইংরেজি একসেন্টে বাংলা বলা।

অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। আর যদি হঠাৎ পয়সাওয়ালা হয় তা হলে তো কথাই নেই। মনে হয় বাংলা বলতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে।

এ প্রবণতা কেন? নিজেদের দৈন্য ঢাকার জন্য? না কি যেখানে মৌলিকত্বের অভাব সেখানে শূন্যতা ঢাকার প্রচেষ্টা? অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষ করে পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিদেশে বসবাসরত পরিবারগুলো ঘরে বসে বাচ্চাদের সাথে ইংরেজি বলেন। ফলে বাচ্চাদের মাতৃভাষা শেখার আর কোনো সুযোগই থাকে না। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা স্কুলে কাটায়। কাজেই যে দেশে থাকে বা যে ভাষায় শিক্ষা নেয় সে ভাষা সহজেই নেয়। ঘরে এসে যদি মাতৃভাষায় কথা না বলা হয় তাহলে তো মাতৃভাষা শিখবেই না।

বাচ্চাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাদের শিখিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষা ব্যবহার করাই প্রয়োজন। বাচ্চারা ভাষা খুবই তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। এমনকি একই সঙ্গে অনেকগুলো ভাষা তারা শিখে ফেলে। ওদের কিন্তু তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত ভাষাভাষী রয়েছে বাঙালি জনসংখ্যার দিক দিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের ভাষা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। আমাদের ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করব। এ গবেষণা কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংগ্রহ করা হবে। মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হবে। বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

পৃথিবীর (১৮৮) একশত আটাশিটা দেশ এখন থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করবে। এ দিবস পালনকালে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমাদের সকলের দায়িত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস করা। ২০২০ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানগরিমায় উন্নত হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে আমাদের ভাষাকে বিকশিত করার জন্য, চর্চা করার জন্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে যত সুন্দর সহজভাবে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় কি তা আমরা বুঝতে পারি? শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষাও শিখতে হবে।

তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে ছোট হয়ে আসছে বিশ্ব; তাই মানুষে মানুষে যোগাযোগও বেড়েছে। জীবন-জীবিকার অন্বেষণে মানুষ ছুটে যাচ্ছে দেশে-বিদেশে। তাই মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি, তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তা মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। রক্তে কেনা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষার চর্চার জন্য আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে। বিশ্বস্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। যে মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পেয়েছে সে মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণ করি সকল শহীদকে। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের প্রতি। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না, আজ তা প্রমাণিত। অনেক রক্ত দিয়ে আমরা এ মহৎ অর্জন করেছি। আজ দল-মত নির্বিশেষে সকলের দায়িত্ব এ মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা।

(পুনর্মুদ্রিত)

উৎস: *শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র ১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪

একুশে ফেব্রুয়ারী

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

Expansion of Human Capabilities and Eradication of Poverty through Mother Tongue Medium of Education

Padma Shri Anvita Abbi*

oraa aamaar mukher kothaa kairaa nite caae
oraa kothaae kothaae sikol podaae aamar haathe paae...
" They want to snatch the words off my mouth.
They bind me in chains at every word I spout"

Abdul Latif.

21st February, a day etched in world history.

Recognized by the UNESCO as International Mother Language Day

Given to the world by 'Bangladesh.'

The movement for Bangla, the mother language of the citizens of the land to be marked as the official language climaxed on this day. The 21 February 1952 saw the agitation against the hegemony of Urdu and it came to a violent culmination when young students laid down their lives while asserting their basic right to use the language of their day to day existence, the language of their thoughts for official purposes. This is the language in which they uttered the very first word in their life. This is the language that they wanted to be adopted for education, judicial and administration purposes. This is the language they laid their lives for. Their movement and their sacrifices bore fruit and in 1952 the East Bengal Legislative Assembly adopted a resolution recommending the recognition of Bangla as one of the state languages of then Pakistan. To my knowledge, there is no other country in the world which has shown so much love and respect to its indigenous language. The very emergence of Bangladesh as an independent nation owes to the

*President, Linguistic Society of India. Formerly Professor of Linguistics at Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Advisor to UNESCO on Language Issues

sacrifices of great thinkers and leaders who wanted to establish a separate identity of Bangla--the language of the nation.

International Mother Language Day (IMLD) has been observed all over the world every year since February 2000 to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism. We will never forget that the date represents the day in 1952 when students of Bangladesh [then East Pakistan] demonstrating for recognition of Bangla were shot and killed by police in Dhaka, the capital city of Bangladesh.

By instituting the International Mother Language Institute at Dhaka the government of Bangladesh has shown respect not only to Bangla but also to all those indigenous languages which are still vibrant as well as those which are on the verge of extinction because of onslaught of forces of globalization and homogenization. I am honoured and humbled to come to this Institute and speak in the presence of the honourable Prime Minister Sheikh Hasina, the mother of the Institute. I am thankful to the organizers especially Prof. Jinnat Imtiaz Ali, the Director of the Institute to give me this opportunity to personally visit the home land of the language movement.

IMLD leads us to reinforce (a) the idea of appropriate language of instruction, usually the mother tongue, in the early years of schooling. The first seven years of a child are formative years when s/he formulates major knowledge of the world. This can only be given in the language that the child is most familiar with, as it enhances its cognitive abilities. Non-mother tongue medium of instruction turns children into translators and that too poor ones who do not fully comprehend the text. Instead of learning new facts and discovering the mysteries of the natural world, children are forced to unlearn their previous knowledge and learn a new paradigm of old facts without establishing any interconnections between various elements. By not following the mother tongue in class, we force children to enter an alien, unfamiliar world, where nothing is appropriate to their lives and nothing connects them to the society and culture in which they live. These children live in dissected and dispersed realities who feel lost in the whole system. The result is the heavy drop-out rate in early schooling.

(b) IMLD raises our consciousness about the quality of education and learning achievements by laying emphasis on understanding and creativity, rather than on rote and memorization. Cognitive abilities are best developed in the early age of a child. The human brain is developed 90% by the age of three. The formative age of children thus, is the age when they enter the school. This is the age when they are already equipped with all the nuances of their mother tongue. If education is imparted in their mother tongue, the learning capabilities are enhanced at a faster rate than if it was imparted in a language that the children hardly comprehend. That is, the quantum and the rate of learning is very fast in the mother-tongue medium. This further enhances the creativity and independent thinking of the child.

(c) IMLD goads us to facilitate education to all, especially for population groups who speak minority languages, and indigenous and tribal languages, and in particular, amongst girls and women. The marginalised societies are generally apprehensive and hesitant to use the educational facilities if the language used in school is not their own. It is necessary to promote literacy and education among these subaltern people by bringing them into the fold of the atmosphere of FAMILIARITY—which can be achieved only in the language they are familiar with in the home environment.

(d) The mother language promotes solidarity and brotherhood among linguistic and social groups based on understanding, tolerance and dialogue. Non-mother tongue teaching robs the basic pleasure of sharing your thoughts and beliefs among the very peer groups and friends who are close to you. Non-mother tongue medium creates alienation among the takers of the system so much so that children lose the very fabric of comradeship early in life. To safeguard social cohesion, to protect the feeling of oneness and to promote friendship and brotherhood so that all grow up to national cause as one entity, it is mandatory that children acquire their initial learning through the medium of their mother tongue.

Our cognition is represented in the structure of language. Languages of the Tibeto-Burman and many East Indo-Aryan languages classify various sensory feelings by reduplicated expressive words, e.g.

Bangla she *miT miT dekhche* 'she looks in a sly manner' or o hu} mu} kore *cholche* 'she walks hurriedly' or for intensification *Tok Toke laal* 'deep red'. These are untranslatable words as each is a complex category representing various sensory feelings and emotions of the specific community. Languages also shape our cognition which is a result of human experience- Bangla classifier □a/□o helps you classify various kinds of nouns. Thus, the mother tongue or the first language of the child is very significant asset for the development of cognitive abilities as well as for creative thinking.

The Mother tongue is not merely an experience acquired in the early age of human beings. It is the vehicle of our cognition, our worldly experience and most important our instrument to shape our brain structure. The long span of human evolution from Homo erectus through the Neanderthal age is due to various reasons including the benign cycle of the structural development of the brain, especially the frontal cortex and expanding cerebral dictionary and the capacity for abstract thinking. We are all aware of the degenerative changes in the neurons leading to dementia in the twilight years of our lives. However, David Snowdon's (2001)[1]- nun study, spanning a long period of 50 years, unequivocally established that those who gained mastery over language [mother tongue being the very first language] during childhood through early adolescent years, had enough reserves of neurons in their brains, to withstand the onslaught of ageing and far less number of such individuals fell victim to Alzheimer's disease.

There are two kinds of memories in the brain. One is the Episodic memory and the other is Semantic memory. The former registers day-to-day events while the latter stores information necessary for perceptual recognition and complex motor skills, including speech and writing. It is the latter which is retained longer in our brain and is instrumental in keeping Dementia and Alzheimer at bay.

Cognitive abilities code into clusters, patterns and fractal structures formed in neural networks by ordering and reordering synapsis between neurons early in life mostly through spoken language and sensory environments. These clusters, patterns and fractal structures are also essential

[1]Snowdon, D. Aging with Grace. (The Nun Study and the Science of Old Age. How We can all Live Longer, Healthier and more Vital Lives). 2001. Fourth Estate. Harper and Collins. London.

seeds for pattern recognition and memory. Memory and cognition has synergetic relationship. This relationship is maintained from early childhood when children acquire their mother tongue.

Different languages highlight a variety of human experiences, revealing multiple aspects of life which indicate unique ways of thinking by the community. For instance, the grammar of the Great Andamanese is anthropocentric as each grammatical category is associated with the divisions of human body. In Bangla, when people take leave they do not say "I go" or "I leave" but *ashchi* 'I come' equivalent to German *Auf weiderzen* meaning thereby that they expect to meet again. The community use of the word *ashchi* 'to come' speaks volume for the ethos and culture that Bangla speakers share among themselves. Once translated in other language *ashchi* as 'I go' the entire socio-semantics is lost. Words evoke knowledge and beliefs!

It is interesting to note that the human brain processes two or more languages differently and in a rather complex way keeping the identities of two languages intact. There are separate neural bases for different languages. In cases of aphasic patients, it is seen that sometimes the first language is retained and sometimes the second. It is deducted from this that a bilingual or a multilingual is better equipped than a monolingual in case of aphasia. Aphasia is a language disorder caused by damage to some or any part of the brain. I can quote the case of Aphasic patient (he was an engineer in BHEL, India who met with a road accident) who was bilingual in Hindi [his mother tongue] and English before the accident which led to damage to some parts of his brain. On investigation, it was found that he lost all the ability to speak, read or write in English but could understand and speak in Hindi.

Languages are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage. All moves to promote dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to develop fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

Professor Amartya Sen rightly said that poverty is not only about

economic conditions and growth; expansion of human capabilities is a more basic locus of poverty and more basic objective of development. Non-mother-language medium education for indigenous children curtails the development of their capabilities and perpetuates poverty.

Giving minor languages or small languages their due status in the judicial system, we ensure that the voiceless are given voice, we ensure the safeguarding of the rights of the marginalised, and we ensure mitigating various kinds of hierarchies which are eroding society. Giving avenues to expand human capabilities one helps to eradicate poverty. The International Mother Language Day reinforces us to acknowledge the power of our mother tongue and enable us to uphold the linguistic human rights.

মাতৃভাষার অধিকার ও 'একুশে'

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য*

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি!'

প্রস্তাবনা

মাতৃভাষার মধ্যে যে কোনো ভাষাভাষীর বিশ্বভুবন বিধৃত। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার বিশ্বপরিচয়। তার আত্মপরিচয় এই ভাষাতেই নিহিত। বলাবাহুল্য, একটি ভাষাগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগৎ এককথায় তার বিশ্ববীক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত। চমস্কিকে অনুসরণ করে আজ আমরা জানি যে ভাষা মানুষের সহজাত। ভাষার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায়। এই ধারণাটিকে আরও একটু ব্যাপক করে বলতে পারি, মানুষ মাতৃভাষার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে জন্মায়। এই মৌলিক অধিকারে হাত পড়লে যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে মানুষ লড়াই করেছে। আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে।

মাতৃভাষা বলতে 'কী' বোঝায়

মাতৃভাষার অধিকার প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন হলো, কোন ভাষাকে মাতৃভাষা বলব? এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যায় (দ্র. বর্তমান লেখকের 'মাতৃভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের মাতৃভাষা প্রসঙ্গ', ২০১৫, *মাতৃভাষা*, বর্ষ ০১, সংখ্যা ০১, জানুয়ারি-জুন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা)। সংক্ষেপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুমোদিত সংজ্ঞাটির উল্লেখ করা যায়। এখানে ঠিক হয় যে, জনগণনার কাজে তিন ধরনের ভাষাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ ঠিক করে নেবেন যে কোন ধরনের ভাষাগত তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করবেন। মাতৃভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে 'মায়ের ভাষা বা শিশু বয়সে কোনো ব্যক্তির বাড়িতে বলা ভাষা, পরবর্তীকালে হয়ত সে ব্যক্তিটি সে ভাষায় আর কথা বলেন না।' অন্য দুটি তথ্যের মধ্যে রয়েছে 'স্বাভাবিক ভাষা' সংক্রান্ত তথ্য অর্থাৎ জনগণনাকালে ব্যক্তিটি বাড়িতে কোন ভাষা বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করেন। আরেকটি তথ্য হলো 'ঘোষিত ভাষা' সংক্রান্ত অর্থাৎ এক বা একাধিক ভাষায় কথা বলার দক্ষতা থাকলে সেগুলি কোন কোন ভাষা? আমরা আবার মাতৃভাষার কথায় ফিরে যাব। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে জন্মের পর শিশু প্রথম যে

*প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভাষাটি শেখে সেটিই হলো তার মাতৃভাষা। এই ভাষা সে তার মায়ের কাছ থেকে শিখে থাকতে পারে অথবা মায়ের মতো তাকে লালনপালন করেছেন যিনি, তাঁর ভাষাও হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে জন্মদাত্রীর ভাষা আর পালক পিতা বা মাতার ভাষা এক নাও হতে পারে। মাতৃভাষা ব্যবহার করেই ভাষী তার চারপাশের সবার সঙ্গে সব রকম প্রয়োজনীয় ভাবের আদানপ্রদান একচেটিয়াভাবে করে থাকে। এই ভাষার মাধ্যমেই সে সমাজে সব রকমের ভূমিকা পালন করে। এই ভাষা তাকে পরিচয় দেয়। ছোট-বড় সব ভাষার ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। ছোট-বড় সব ভাষারই সমান অধিকার ও মর্যাদা। তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যবহারের দাবিতে মানুষ সোচ্চার। এর অন্যথা হলে মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ হয়, লড়াই হয়, রক্তক্ষয় হয়।

ভাষা আন্দোলন : ভারত প্রসঙ্গ

ভারতে নানা জনগোষ্ঠীর বাস, তাদের নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্ম। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে ভাষাকে কেন্দ্র করে জনজাতির উন্নতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। এর পিছনে যে সত্যটি রয়েছে তা হলো, ভাষা জনগোষ্ঠীর সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির ধারক-বাহক। তাই মুখের ভাষার অনাদর, অবহেলা মানুষ সহ্য করতে পারে না। মাতৃভাষার উন্নতি, মাতৃভাষার ব্যবহার তার আকাঙ্ক্ষিত, তার প্রাণের আরাম। কোনো ভাষার উন্নতি সময়ের স্রোতে স্বাভাবিকভাবে হতে পারে। আবার ভাষার উন্নতি ভাষাপরিকল্পনার মাধ্যমেও হতে পারে। ভাষাপরিকল্পনায় সাধারণত সরকারি উদ্যোগের একটা ভূমিকা থাকে। আবার অনেক সময় ভাষাভাষীদের দাবি বা সচেতনতাও ভাষাপরিকল্পনার পেছনে কাজ করে। তখন এই প্রচেষ্টা আন্দোলনের আকার নিতে পারে। আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয় একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণে। কখনও একটি নতুন রাজ্যের জন্ম হয়, কখনও-বা একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অবধারিতভাবে জনগোষ্ঠীর কাছে ভাষা একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ, এটি একটি সত্য যে ভাষা মানুষের সত্তার সঙ্গে জড়িত। তাই আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা মানুষকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধে।

ভাষা আন্দোলনের মূলে থাকে জনগোষ্ঠীর ভাষাসংক্রান্ত নানা সমস্যা। ভারতের মতো বহুভাষী দেশের কোনো অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে একাধিক ভাষার ব্যবহার থাকলে কোন ভাষাটির ব্যাপক ব্যবহার হবে; কোনো একটি ভাষার কোন রূপটি বা কোন উপভাষাটি ভাষাব্যবহারের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে; কোনো ভাষার লিখিত রূপ না থাকলে কোন প্রচলিত লিপিটি গ্রহণ করা হবে, নতুন লিপির উদ্ভাবন সম্ভব কি-না ইত্যাদি নানা প্রশ্নে ভাষাভাষীরা আন্দোলিত হতে পারেন। লিপিসংস্কার, বানানের সমতাবিধান, ভাষার 'শুদ্ধতা' বজায় থাকবে কোন ভাষারূপটি গ্রহণ করলে ইত্যাদি নানা বিষয় ভাষাভাষীদের আলোড়িত করে এসেছে।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে ভাষাসংক্রান্ত নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। যেমন, হিন্দিভাষী এলাকায় মৈথিলির উন্নতি, বিকাশ, মান্যায়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯ সালে মৈথিলিকে পাঠ্য বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩ সালে এবং পাটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৯ সালে মৈথিলি পাঠ্যবিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাপতি চেয়ার'-এর সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সালে মৈথিলি সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২০০৩ সালে এটি সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রসঙ্গত উঠে আসে সিন্ধি ভাষা ও তার লিপিসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা। আনুমানিক ১৯৪৯ সালে দেশভাগের পর ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে যে ১৪টি ভাষার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল, তার মধ্যে সিন্ধি ছিল না। ভৌগোলিক পরিসরের নিরিখে ভারতে কোনো একটি জায়গাতে সিন্ধিভাষীদের অবস্থান ছিল না। ফলে সিন্ধিভাষীদের মনে আত্মপরিচয়ের সংকট ঘনীভূত হয়। 'সিন্ধি সাহিত্য মণ্ডল' পরে যার নাম হয় 'অখিল ভারত সিন্ধি বোলি ও সাহিত্য সভা' সিন্ধি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাতে থাকে। ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম তফসিলভুক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে সমান অধিকার ও মর্যাদা পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল এই আন্দোলনের মূলে। অবশেষে দেশভাগের প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৯৬৭ সালে সিন্ধি সংবিধানের অষ্টম তফসিলে স্থান পায়। ফারসি-আরবি না দেবনাগরী-সিন্ধি ভাষা কোন লিপিতে লেখা হবে তা নিয়েও দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এখন ভারতে সিন্ধি লিপি হিসেবে দেবনাগরী স্বীকৃত।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী তেলুগু না আধুনিক তেলুগু গৃহীত হবে, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তেমনই তামিল ভাষা শুদ্ধীকরণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল এই যে তামিলের উর্বরতা, শুদ্ধতা, শক্তি ও সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছে অ-তামিল ভাষা বিশেষ করে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার। এই শুদ্ধীকরণের চিন্তা অবশ্য প্রধানত শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল।

ছোট ভাষাগোষ্ঠীগুলি সাধারণত প্রধান বড় ভাষাগোষ্ঠীগুলির সংস্পর্শে থাকার জন্য নিজেদের সংহতি ও ভাষা-সংস্কৃতির বিপন্নতার আশঙ্কায় ভোগে। দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের ফলেও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয়েছিল। সব মিলিয়ে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই সংহতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে যায় স্বতন্ত্র রাজ্য বা অঞ্চল চিহ্নিত করার দাবি। অনেক সময় ছোট ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর একাধিক রাজ্যে অবস্থান দেখা যায়। যেমন, সাঁওতালি ভাষাভাষীদের বাস ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে। অন্যদিকে জুয়াঙ ভাষাটি শুধু ওড়িশাতেই বলা হয়। আবার হিমাচল প্রদেশে কুমায়ুনি, গাড়োয়ালি, কাংড়ি, কুলবি ইত্যাদি স্থানীয় উপভাষা

বাদে মান্য হিন্দি কম সংখ্যক লোকের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় ছোট ভাষা যেমন বিয়াংসি, চউদাংসি, রংপো, রাজি, স্পিতি, কিন্নৌরি ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে। কারণ এই রাজ্যের বেশির ভাগ লোকই দ্বিভাষী, মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দিতে পারদর্শী। এই সব ছোট ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের সম্ভাবনা ছিল এবং বাস্তবে তা বিভিন্ন সময়ে রূপায়িতও হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী সাঁওতালি ভাষাভাষীরা তাদের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছেন। একে একে সংগঠিত খেরওয়ার আন্দোলন ও আদিবাসী আন্দোলন লক্ষণীয়। উনিশ শতকের 'খেরওয়ার' (শব্দটি সাঁওতালি ভাষায় বীরত্বসূচক) আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিদেশি ইংরেজ শক্তি ও অন্যান্য বহিরাগতদের উৎখাত করা হলেও সাঁওতালদের এই উত্থান অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেও বটে। বিশ শতকের তিরিশের দশকে আদিবাসী আন্দোলন আকার নেয় অন্য ভাবে। আন্দোলনের দাবি হয় ছোটনাগপুর এলাকার জনজাতিদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ স্থাপনের। তাছাড়া বিহার রাজ্যসভায় জনজাতির একজন শিক্ষিত প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা এবং সাঁওতালি ও অন্যান্য জনজাতির ভাষাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার দাবি ওঠে। বলাবাহুল্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়ে সচেতনতার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে এই আন্দোলনে। ধীরে ধীরে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু উদ্ভাবিত 'ওলচিকি' নামে এক নতুন লিপির ব্যবহার শুরু হয়। অন্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে নিজেদের জাতিসত্তা বিলীন না হয়, সেই চিন্তা থেকে মুণ্ডা, হো, ওরাঁও, ভূমিজ, বিরহোর প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতি সংহতি রক্ষা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল হয়।

তেমনই উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলি আন্দোলন করেছে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সংহতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি। উদাহরণ হিসেবে স্বতন্ত্র নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় রাজ্যগুলির উল্লেখ করা যায়। মণিপুরে মণিপুরি ভাষার লিপি পরিবর্তনের আন্দোলন ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে মণিপুরির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আন্দোলনের কথাও ওঠে। ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা ও লিপির স্বীকৃতি নিয়ে আন্দোলন, আসামে স্বতন্ত্র অঞ্চলে বোড়োদের সংহত অবস্থান ও শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বোড়ো ভাষা ব্যবহার করার জন্য আন্দোলন চলছে। খাসি, গারো, মিজো প্রভৃতি ভাষার সংবিধানের অষ্টম তফসিলে স্বীকৃতির দাবি রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রধানত আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের সংকটজনিত আশঙ্কা কাজ করেছে। জনজাতিগুলির কাছে ভাষা তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক।

আমার সোনার বাংলা : বাংলা ভাষার জন্য

পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তার চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেশভাগের পরপর উর্দুকে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা ওঠে তখনই বাঙালির জাতিসত্তাবোধ ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য-চেতনা জাগ্রত হয়। ভাষা আন্দোলনের

বীজ তখনই উপ্ত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে বাঙালি সত্তা গর্জে উঠল। রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে তার সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নটি জড়িত। বিক্ষুব্ধ বাঙালি সত্তা আর পেছনে ফিরে তাকায়নি। আন্দোলনের পথে, সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেছে। ছাত্র-আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো। বাংলা হলো রাষ্ট্রভাষা। এই প্রসঙ্গে আসে মাতৃভাষার জন্য ভারতের বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচরে এগারোটি প্রাণ বিসর্জনের কথা। মাতৃভাষার জন্য, জাতিসত্তার স্বাধিকারের জন্য বাঙালির আত্মদানের মহত্ত্ব স্বীকৃতি পেল আন্তর্জাতিক স্তরে। ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* হিসেবে ঘোষণা করা হলো। জীবনের সর্বস্তরে সকল কাজে মাতৃভাষার ব্যবহার আকাঙ্ক্ষিত। সকল মাতৃভাষারই এই সুযোগ থাকা উচিত। আমাদের দুই বাংলার বাঙালিদেরও ভেবে দেখতে হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের সত্তার খুঁটিনাটিকে খুঁজে পাই কি-না।

'একুশে'

সারা বিশ্বে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে যেখানে লড়াই হয়েছে, সে লড়াই শুধু ভাষার জন্য নয়, সে লড়াই আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য। সে সব লড়াইকে বাহান্নর 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছে। 'একুশে' আজ আর শুধু আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপন্ন পূর্বপাকিস্তানের মানুষের জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা-আন্দোলন বলে গণ্য নয়। 'একুশে' আত্মপরিচয়ের সংকটে বিপন্ন বিশ্বমানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের প্রতীক। তাই 'একুশে' আর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগ্রহে উদ্বেল বিশ্বমানবচেতনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'একুশে' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বাহান্নর সীমানা ছাড়িয়ে কালোত্তীর্ণ হয়ে স্বাধীন বিশ্বমানবচেতনা দিবসে পরিণত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), ২০০৩, *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, ২০০৩, "উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ভারতের ভাষা ও ভাষা-আন্দোলন," *ভাষা ও ভাষা আন্দোলন*, ড. সঞ্জিত ভট্টাচার্য ও উত্তম দত্ত (সম্পাদিত), কলকাতা: সুমুদ্রণ, (প্রাপ্তিস্থান-পত্রপুট)।

ইংরেজি

Annamalai, E. 1979. *Language Movements in India*. Mysore: Central Institute of Indian Languages.

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল
যে শিশু আর কোনদিন তার
পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না
যে গৃহবধূ আর কোনদিন তার
স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
যে জননী খোকা এসেছে বলে
উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে
পড়ার আগে বারবার একটি
প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে
চেষ্টা করেছিল
সে অসংখ্য ভাইবোনদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত
যে ভাষায় আমি 'মা'কে সম্বোধনে অভ্যস্ত
সে ভাষা ও স্বদেশের নামে
এইখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে ॥

২১/০২/১৯৫২

(কবির স্বহস্ত লিখিত পাঠ থেকে)

Language Supremacy or Hegemony : Planning and Realities

Mohammad Daniul Huq*

Abstract

While total number of languages in modern world is coming down and socio-linguists are concerned about endangered languages, the fast moving global trend is making things even more controversial. Question aries whether indigenous languages should give up to only couple of dominating international languages, or national and/or ethnic identity with uniqueness that must be preserved at any rate.

UNESCO of course admits separate identity of vernaculars as an inborn right. Nonetheless, all indigenous languages can't cope up with the challenges of the modern world let alone standing firm against languages' dominance.

Having considered the above mentioned dilemma this paper attempts to present forth the case of Bangla, the 5th language of the world in rating.

Bangla being one of the best developed languages of the world, unfortunately faces a silent challenges as to how to go about for keeping pace with the fast developing world powered by high-teck modalities.

Bangla as such is a rich language with a richer literary heritage and unique linguistic features. Admitting those salient features of Bangla this paper at the same time reveals the development of Bangla at the backdrop of global understanding through languages and tries to address the problem of unity in diversity.

*Retired Professor of Bangla and Linguistics, Jahangirnagar University and now continues as a Part-time teacher of Linguistics at the Dhaka University

Introduction

After the Second World War the trends of establishing indigenous language as the state language began emerging as vital issue in the recently colonial dominance-free countries. Consequently language conflict became prominent between the colonial and indigenous languages. Again, while establishing indigenous language there appeared many rival languages within the country and then the language conflict started forming in new shape. As a result, there sprung language problems of different magnitude, widely in many of Anglo-phone and Franco-phone countries of Asia and Africa.

Ironically, the first ever conference about language problems of South Asia that took place in Ceylon (Sri Lanka) in 1953 by UNESCO was themed on "In search of a single medium of communication for living in the same world." But in the same year UNESCO published a book as well about using indigenous language in the education system. So called "single medium of communication" ironically proved futile in the long run by now.

Now that, on the long run, only couple of languages have taken over the whole gamut of international scenario, not to speak of knowledge and education for that matter, at the turn of the century, a term "Language hegemony" has come by only to remind that problems of language overlapping and dominance of certain language over others is still a problem to be addressed. Question arises how theoretical advocacies have so far resolved the problems in the level playing field by implementing language planning modules.

In this paper I have not drawn any conclusion or any personal decision either, but have presented what I notice in my observation on the basis of the language development and the prevailing situation in my apparently mono-lingual country (Bangladesh). As relevant issues there appear some considerable points of unusual social context and the clues of some useful information that can be of some help in the identical or related situation.

Prelude

In the end of the 19th century researchers advocated that language could be changed with well thought efforts for the sake of society

and state. Therefore, well thought efforts of language problems and solutions were deemed as the foundation of language planning in linguistics of modern time (Nath 1989:125).[1]

From somatic review it was clear that the activities of language planning emerged for two reasons.

1. Solution of language problem in colonial dominance free countries;
2. Right after the ending of colonial imperialism newly independent nations in their problem-centric analysis of conscious language change started getting the advantages of international languages alongside establishing their mother tongues. In the context of new language situation there appeared manifold crisis and new problems. Therefore, language planning became an inevitable phenomenon in order to resolve these problems. Since then language planning got underway in these countries.

In the 60s many conferences took place and many books were published simultaneously. *Language Problems of Developing Countries* – a book published (1968) with the financial support of American Society for Sociological Research Council (SSRC) took up the real theoretical discussion on language problems that got underway for the first time. And no wonder, French and English, for the first time, were the two main languages among the colonial languages in the recently independent countries that came in the lime light. It thus follows that the gradual progression of language planning emerged from the problems of using national languages and the retention of developed second or colonial languages.

That is how the changes of human languages become linked with the changing pattern of time. Then it seems necessary to do something with a view to apparently controlling language of flourishing it properly in the future.

The 'hegemony' factor

It may seem worth discussing the distorting effects of cultural or language hegemony on speech situations and the subsequent

meaning for locating emancipatory action in the discursive realm; but for our present purpose we may skip that kind of deliberation for time and context constraints. Obviously, a language's influence widens as its speakers grow in number and power. Some languages have seen periods of wide-spread importance, and have had varying degrees of influence on the native languages spoken in the areas in which they have held sway. Historically, with the expansion of the colonial power English and French became the arbiters of reality. And now, it is English in the age of computers and IT. If it is not in English, then your knowledge doesn't count. Since language hegemony influences information and cultural meanings, hegemony of language is said to be even comparable to control of ideas.

Supremacy of English: the binary fact

These days English language is the language of globalization. But this English language can be seen as both a positive and a negative influence upon other languages and cultures. How genuine is the argument that the excessive use of English is to the detriment of other native languages and cultures? English is seen functioning on two levels, according to Robert McCrum: "*International Standard (internationally functional) and Local Alternative (locally functional)*". The world surely needs a global and commonly understood language. For the time being we seem to be struck with English although it is perhaps not the best choice due to its colonial past. But in reality Bangladesh is on a different boat, unlike of "second-language" English speaking countries such as Nigeria, Singapore or India for example.

Language planning as such : The Bangladesh perspective

Language related planning might be difficult in formulating the national language where more than one language is used as societal or political language. India and Sri Lanka are two good examples of this situation. During Pakistan regime, it was our problem (Please see forthcoming discussions). As a result, real constructive and helpful language planning was never introduced. Sometimes the issue of language planning was raised haphazardly but in the pre-independence (March 1971) time it was all together a futile attempt. After four decades and a half of independence, again, the

main issue from language planning and discussion regarding its application deems to appear in the front line. And that is, self-reliance in case of language has not been established despite having the beautiful mono-lingual situation and society in Bangladesh.

After the independence of Bangladesh with the political changeover language situation in the context of history has changed as well. So the time for language planning and implementation came long before. But in the razzmatazz of recent independence Bangladesh suffered with many serious problems that needed immediate solution. In this situation the issue of language planning could not receive much attention. Although in the time of *Shahid Dibash* (The Martyrs' Day) many talk about the development and modernization of language indirectly, language planning (though an important as most other important economic-social five/ten years plans) could not be nourished as equally important for implementation. However, nothing was raised or done as such.

The enthusiasm and spirit we had right after the independence and also the pride for being mono-lingual, one could easily think that there is no language related problems at all. And perhaps, out of that kind of self-complacency we did not see any birth or growth of long term language planning. Nothing special was done except spouting the slogan in the socio-political field 'Bangla will be the only language in every sphere of national life'. We do not need a language planning as we are mono-lingual – was a wrong perception. Consequently, after a long time, the question of language has again given rise to confusion in national sector even in the sensitive field like education.

I have, of my own accord, in several times, presented the topic before the influential people, bureaucrats who are the major stakeholders of pivotal activities of the society and the directors of state machinery. Most of them did not give importance to this idea as it is of micro level and limited peripheries. They also opined that the making of language planning and its implementation is not appropriate for this poor country.[2]

However, that after the independence of the country it was an utter necessity of making a language planning in its macro and micro level

and also implement effectively in its gradual process, this real truth was never unveiled. The people belonging to the superficial stage, who could perceive a little, wanted to give a quick and early decision saying that Bangla is the state language, English is an international or foreign language and there are religion related languages like Arabic, Sanskrit and Pali. So where is the justification of planning and taking efforts of implementation of these languages?

Language situation of Bangladesh

Theoretical consideration implies that internal components of language planning be divided into two ways: (1) Status planning, and (2) Corpus planning. Standardization comes under corpus planning; and also when a state or internal or international organization selects a language from its traditional status out of many languages and confers a new identity in a relatively new situation is termed as identity planning [Nath (1989), Fishman (1977), Rubin and Jarnudd (1971), Rubin & et el, Musa (1983)]. Like language planning of many other countries, *s*tatus planning in case of language-use in Bangladesh should have been primary concern. Also, from its theoretical point of view a model of language planning, have phases (as were followed in the Philippines when it gained independence from Spanish colonial power). In the past in Bangladesh it was not learnt if this kind of language planning from theoretical point of view was thought.

In Bangladesh however, constitutionally conferred "The state language of the Republic is Bangla". ["প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" । (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩)] Use of English for international communication, trade and commerce is also widely accepted. Furthermore, English has extensive use in the field of higher education, technology and research. Besides Arabic, Sanskrit and Pali are used for religious practices, but tacitly is forgotten of the tribal or minority's languages.

Up to this extent of consideration, seemingly there is no problem in the language situation of Bangladesh. In fact, the language situation here is not free from problems although Bangla is the mother tongue of 96.6% people. This situation still prevails even after the partition of India and the emergence of Bangladesh. The country

seems to be divided in the critical juncture of mother tongue/state language and dominating foreign language.

Bangla is not that strongly established in our life, society and state even after four and half decades of independence. Conscious linguist and a proponent of Bangla Dr. Humayun Azad (1999) gave answers of the reasons of this situation. In analyzing the characters of society and state controllers, he found a hostile relationship with Bangla. His strong remarks did not yield any satisfactory progress. Bangla is not well established in two important areas out of four which are namely daily life, literature, education and administration. Bangla faces a strong resistance in education and stronger in administration and the emerging corporate culture of Bangladesh. Dr. Azad was worried that Bangla along with the exploited common masses has less possibility to be established even after many decades of 21st century. His inner feeling was that colonial maze being one of the main problems of Bangladesh is also found clearly in the field of language. Bangla remains only as the state language nominally. Political leaders, lawyers, doctors, businessmen, teachers and intellectuals (who are the direct beneficiaries of independence) are engaged in reminiscence expressing through the language of their past masters. Colonial language became the state language automatically as it happened in many countries of Africa where there was no language of their own having great heritage. But problem occurs in those countries where there is one or more than one great heritage languages. India, Sri Lanka and the then Pakistan realized this problem seriously.

Bangla versus English – Attitudes and Practical Reality

History reveals that Bangla speakers began learning English – the royal language before the *Battle of Palasey* (1757) for their own benefit and not for enjoying the beauty of English literature (Azad 1999). English was introduced as the language of administration after 37 years of the occupation of *Banga* (বঙ্গ, the Bengal) by the British ruler (1835). Before that, Farsi (the Persian), the language of the then Mogul court was practiced widely – even by the English usurpers.

The British rule of about two hundred years in this sub-continent (also in some neighboring lands) established English language; side by side had opened up windows towards the West and the developed world as well. But the practical reality is, we could not achieve its advantages appropriately so far.

After the partition of India, anti-Bangla policy faced great resistance in the then newly formed Pakistan. Bangla was not properly introduced. Furthermore, English remained as a practical official language despite the historic language movement in 1952. During this long span of time it was not possible to resolve language conflict and establish language discipline in its applied way.

However, right after the independence of Bangladesh, there was a great enthusiasm to introduce Bangla in every sphere of life. But the social elite and controllers of the state presented some by-product problems like lack of proper terminologies/jargons and enough numbers of type writers in Bangla as the barriers to this overnight achievement.*

Ultimately they tried to go back to depending on well-accustomed English culture.

After Tariq Rahman we can say, English continued firmly, entrenched in the domains of power in Pakistan after 1947 with blessings from the ruling elite. The real policy can be understood with reference to the elite's patronage of English in the name of efficiency, modernization and so on.[3] But why members of those elites, who came increasingly from the lower-middle and middle classes which have studied in Bangla-medium schools (or schools which are called English-medium but teach mostly in vernacular), should also want to preserve, and indeed strengthen, the hegemony of English—a language which has always been instrumental in suppressing their class? It is not a riddle to answer. The fact is that the elite invested in a parallel system of elitist schooling of which the defining feature is teaching well all subjects, other than Bangla through the medium of English. This has created a new generations,

*Please see forthcoming discussion in the last section 'Not a grim picture all together'

and ever increasing pools, of young people who have a direct stake in preserving English. All the arguments that applied to a small Anglicized elite of the early generation of the then Pakistan now applies to young aspirants who stand ready to enter the ranks of this elite. And their parents, themselves not at ease in English, invest far too much in their children's' education to seriously consider decreasing the cultural capital of English.

At least for the last century and half, the people of this part of the world have taken the ascendancy of English for granted. In recent years with more young people from the affluent classes appearing in the British O' and A' level examinations, with the world-wide coverage of BBC and CNN, with globalization and the talk about English being a world language, with stories of young people emigrating all over the world armed with English – with all these things English is the commodity in more demand than ever before. The children of elitist English-medium school are indifferent to Bangla and sometimes proud to claim to be bored by its literature. They would be rather proud to claim that lack of competence in the subject even when they get 'A' grades in the O' and A' level examinations. They love to read only English books and hardly Bangla ones. Indeed any language but English to them is so low in prestige that they think education in them does not count as education at all.

The Pakistani government had rationed out English. The armed forces that time created cadet colleges from the nineteen fifties onwards. Those schools, run on the line of elitist British public schools, were subsidized by the state.[4] In short, by supporting English through a parallel system of elitist schooling, Pakistan's ruling elite acted as an ally of the forces of globalization at least as far as the hegemony of English, which globalization promotes, is concerned. This militates against linguistic and cultural diversity, weakens the 'have-nots' even further and increases poverty by concentrating the best paid job in the hands of the international elite and the English-using elite of the peripheries.

Well, English after all, is the language of the greatest power in the world. It did spread as the language of colonies of Britain (Brutt-Griffler 2002). And now English spread because of American

economic power, American control of world media and international commerce. [This has been condemned as 'Linguistic Imperialism' (Phillipson 1992), and Tove Skunabb-Kangas (2000) calls English a 'Killer language']. But the fact, for present situation remains that, globalization will increase the power of English because it will open up more jobs for those who know it.

On the surface it seems that classes of people basically maintained English for the sake of their self-interest. As a result, conflict between Bangla and English, dilemma, illusion, snobbery, pseudo-modernism, and debate within the ultra-modernism remained unresolved – despite many repeated declaration of introducing Bangla in every sphere of life on many occasions during this long period of time. The same secret/latent struggle between two sides is still going on. Anti-Bangla tendency is active and working in many places of the country-machinery. However, no government, seemingly, in the post-independence time Bangladesh has ignored Bangla – rather high officials have always stressed Bangla in principal, but not quite in practice. Unfortunately, their directions were not implemented for obvious reason.

The best example of conflict between Bangla and English existed in our education sector. A triangular /puzzle/disorder has been prevailing in education sector since its origin. Although Bangla is taught in the primary and secondary level of education, with every change of the government our education policy makers are being puzzled by the question of Arabic for religious purpose and compulsory English. The after effect is that the current standard of education is disappointing (rate of fails in the English tests of schools and colleges are mentionable, let alone judging the university admission tests), knowledge and skill of Bangla is not that satisfactory either. And it is needless to mention the success of Arabic and religious education in the traditional schools.

The fact that not too many English graduates can write a job application properly, is not untrue. On the other hand, it is disappointing also to see a piece of Bangla writing with mistakes and inconsistency by a student who studied through Bangla medium. Use and write-ups of Bangla in official works, legal documents and correspondences

seldom care a little about the correctness. Bangladeshis in their foreign correspondence and trade and commerce often times use 'weird type of English'. And again some quarters of Bangladeshi learners studying in posh English medium schools boastfully declare 'I do not know good Bangla'. Perhaps, most of them even don't learn English properly. But English medium schools are mushrooming and some of them have gained popularity in the urban areas at the cost of aristocracy, management and money. The craze for living and migrating to foreign countries has become acute in this situation.

In this prevailing state, the current language situation has become responsible for this triangular outcome of education, administration and language use. The lack of knowledge and skills of Bangla among the people studied through Bangla medium, artificial social status of English educated people and critical social status of Madrasa educated people – all these indicate the lack of our education system originating in the language situation.

The following may be taken as the brief points of the current language situation of Bangladesh:

1. 'The state language of the Republic is Bangla'. This short sentence placed in the 3rd paragraph of the 'Constitution of the People's Republic of Bangladesh' (all through written in Bangla scripts) was legally and unanimously accepted on 4th November 1972.
2. Government's official language is Bangla. However, in different occasional discussions and demands English is widely used in foreign correspondence, trade, maintaining aristocracy and modernity, information technology, technology and electronic data transfer and collection, promoting the recognition of different commodities, variety of hoardings, sign-posts of urban shopping outlets and TV channels.
3. Although Bangla is used in most areas of education, in respect of overall standards there is no good parity between languages. The recent rapid increase of English medium schools has caused an uncontrolled disparity with

Bangla medium and Madrasa education system.

4. In the grass root level of administration Bangla is used, but it is not very organized. Again the standard and manner of little English used here is not satisfactory either.
5. There is a little practice of learning other international languages in Bangladesh.
6. There are more than 30 ethnic languages used within the national boundary of Bangladesh. However, there is no effort of developing, standardizing and further application of these languages.
7. Last but not the least point is the socio-political determination in case of language is so confirmed that who will use which language in which situation is a dilemma all together.

It is needless to say that we have reached the same point of the circle where we started our journey. We do not have any language planning which is effective, far reaching, and sincere and an outcome of strong determination. We do not have any clear perception about it either.

All efforts regarding language of Bangladesh are the victims of that triangular inconsistency. We have a national language by name, but not by status in true sense.

The target of practical effectiveness of so-called international language English which was supposed to have reached has not been achieved.

Religious language is confined to the rituals of religion and so is the minority languages confined to themselves.

Common people cannot raise questions regarding language use in three armed forces, though there is always a questionable feeling in some instances. It is difficult to know why the language of legal affairs and administration cannot come out of colonial traditions even after three decades. The very old question is still legitimate

under the current situation that, why Bangla cannot replace the language of government policy, order, rule, constitution of newly formed organization, work order, name of mass awareness programs where the prime concerned are Bangladeshis?

Is it the hegemony of some colonial/international language or failure of a sustainable language planning and its implementation?

Some examples: extracted from a Daily (*The Dainik Bangla*, a Government funded daily that no longer exists after 90s):-

a. February 1, 1972. 'Every work is being done through Bangla' says the president.

b. February 21, 1972. 'Bangla has little progress in practice'.

c. February 19, 1973. 'A committee has been formed in the government level'.
(A 13-member committee has been formed headed by the minister for education to remove different barriers to the use of Bangla in all government activities.)

d. February 19, 1975. 'Bangla has to be established as the medium of education' says education minister. He further said yesterday that government is well determined to establish Bangla as the medium of education.

e. February 21, 1977. 'The government is pledge-bound to establish Bangla.'

f. February 16, 1978. 'The interest for foreign language rather than Bangla is not fair'.

g. February 2, 1979. Planning ministry of the government gave a directive to different banks on 28 December: 'From now on every work within the country has to be done through Bangla.'

h. February 23, 1980. 'Assurance is needed to introduce Bangla in government activities.'

Beside these seasonal efforts of *Language Martyr's Day* (21 February)

many individuals remained loyal to their English language use. One of the most queering examples contradicting the pragmatics of the spirit of introducing Bangla in an effective way can be exemplified. Example of this kind was a detailed declaration made in English from the cabinet division, cabinet secretariat, Government of the People's Republic of Bangladesh highlighting strong order in favour of Bangla and punishment in case of violations. There has been not a single instance of punishment, known to us thus far, despite breach of this order in various cases.

Not a grim picture all together:

The truth which has come out of this deliberation is that our administrators, industrialists, businessmen, different controllers of education, the state and the society are foiling all the efforts of establishing Bangla language and the exploited common masses as well. Nonetheless, a great deal of advancements in reality and practical terms have been achieved as a process of natural development.

One mentionable achievement of all was the unique contribution of Shahid Professor Munier Choudhury towards the modernizing, developing and pragmatic/practical use of Bangla. He redesigned and very successfully planned the Bangla orthography in typewriter keyboard in collaboration with the Optima of the then East Germany. A considerable improvement was made over the keyboard resulting typing speed increasing considerably.[5]

The most pivots of the developments are the advancement in the IT sector where Bangla has successfully made a vital position. Over the last decades and half it has been possible to introduce Bangla in Computers and IT services. Using Bangla orthography was limited only in the advanced printing device of PTS (Photo Type Setting). But some enthusiastic young genius starting way back in 1984 came up with image settings of computer bytes for Bangla. That did not first give out prints or a comfortable use in the IT system. But couple of people like Saif Shahid and Mustafa Jabbar (not even person of IT or Computer Technology but a Bangla graduate) ultimately came up with a tangible Bangla program based on ASCII code. In gradual progress this program was able to accommodate

the somewhat complex orthographies of Bangla writing system. (Bangla writing system is little complicated because of its three tire fonts and shapes of vowel, consonants and hosts of conjuncts that take different shapes as positional variants.) A breakthrough came by when traditional offset printing by PTS system was replaced by computer generated composing and printing which in no time captured the whole publication domain by itself. Bangla by computers are taking care of need for print and electronic media. Developments of different efficient and aesthetic fonts are now the reality that was not possible by the Government agency who failed to introduce even a Bangla electric type-writer. Lately, after Bangla program was made compatible to Unicode, now it is very much in use in the internet and websites (including the sites of BBC and the like), mobile phones and like. Introduction of Bangla SMS system in the mobile cell phones was like a cup of tea to many of the young folks who came up with different users' friendly softwares. Bangla software of ticketing system for travels, amusements, supper stores' teller machines has come as the part of life. Though we are yet to see the reality of Bangla-English-Bangla translating machines, days seems not too far away. All of these corpus planning and development, somewhat sporadic though, done by the individuals or private entrepreneurs cannot be belittled.

Conclusion

One thing is for sure that despite all odds Bangla is going not only to survive but also to prosper for several different reasons and pragmatics. There is one reason why Bangla is safe -- because of the huge pool of people very proficient in it and especially because it is used extensively in lower level jobs, the media, education, courts, commerce and in other domains in Bangladesh and over all, used in practical life. Bangla is a huge language with its rich culture, literature and must stand up-right all through despite many improper care of the time being. Only lacking is a proper language planning and its effective implementation in a perspective manner.

End notes

1. In the book titled *International Communication : A Symposium on Language Problem* (1931) had discussions dealing with Language

Problem, Language Situation and Constructed Language and many other ideas and their ways to overcome problems in international communication. Socio-linguist Professor Mansur Musa of Bangladesh considered these thoughts and activities as early introduction about language planning of the 50s (Musa 1984). As the way of development in this field we may just recall that, the phrase 'Language Planning' was first used by Uriel Weinreich in a seminar of Columbia University in 1957. In November next year (1958) E. Haugen presented a paper on the same topic in a seminar organized by the American Anthropological Association. Later Punnyosloka Roy (1961), Valter Tauli (1964) and E. Haugen (1966) gave a broad perspective to the theoretical foundation of language planning.

2. The irony of the fact is that one may hear of various kinds of planning in Bangladeshi society and national life – Economic Planning, Education Planning, Health Planning, Family Planning and so forth. However, the phrase 'Language Planning' is not only unfamiliar with educated people but also unfamiliar with highly educated experts and the people involved in the policy making of the state administration. Perhaps, a small number of people who study sociology (teachers of college and university, who study language and literature and the like) are familiar with this 'language planning' and they, in fact think about the subject.

3. The Civil Service of Pakistan (CSP) was an Anglicized body of men who had molded themselves in the tradition of British. The officers' corps of the armed forces was no exception of Anglicization. The 'British generation' dominated the army till 1971 (Cohen 1994). It is well understandable that members of those elites had a stake in the continuation of English, because it differentiated them from the masses giving an upper hand, also gave them a competitive edge over those with Bangla-medium or traditional education, and above all, possibly, was the kind of cultural capital which had snob value and constituted as a class-identity maker.

4. In the 1960s when students from ordinary colleges, who came by and large from vernacular-medium schools, protested against these bastions of privilege, the government appointed a commission to investigate into their grievances. The report of that very commission agreed that such schools violated the constitutional assurance that

'all citizens are equal before law' (Paragraph 15 under Right No. VI of the 1962 Constitution). However the Commission was also convinced that these schools would produce suitable candidates for filling elitist positions in the military and the civilian sectors of the country's services (GOP 1966: 18). This meant that the concern for equality was merely a legal nicety. And this, indeed, was what happened.

5. The very first proto-model of the machine the "Munier Optima" that Professor Munier was sent from the factory for trial was later handed over to this writer who had the privilege of mastering in speed-typing in Bangla, and also taking part over the years to work for further developments for large scale and extensive use of Bangla typewriter in all official, commercial and personal uses.

Reference:

Azad, Humayun (199). *Bangla Bhashar Shatru Mitra* (Friends and Foes of Bangla Language), Agami Prokashoni, Dhaka.

Brutt-Giffler, Janina 2002. *World English: A Study of Its Development*, Multilingual Matters Ltd. Clevedon.

Cohen, Stephan p. 1994. *The Pakistan Army*, Oxford University Press, Karachi.

Haugan, E. (1972). "Language Planning : Theory and Practice". In *Advances in the Society of Language*. Vol.II, the Hague: Mouton.

Huq, M.Daniul (2003). "Bhasha Porikolpona : Bangladesher Bhasha Paristhiti". In *Publication of the International Mother Language Institute of Bangladesh*, Dhaka.

Kloss, H. (1969). *Research Possibilites on Group Bilingualism: A Report*, Qebec International Centre for Research on Bilingualism.

McCrum, Robert (2001). Globish: *The Story of English*, Norton, N.Y.

Musa, Monsur (1984). "Bhasha Porikolpona" (Language Planning), in *Bhasha Parikalpana O Anyanya Prabandha*, Muktodhara, Dhaka.

Nath, Mrinal (1989). *Samaj Bhashabigganer Ruprekha* (Outline of Socio-linguistics), Bangladesh Language Society, Dhaka.

Rahman, Tariq. 1999. Language, *Education and Culture*, Oxford University Press, Karachi.

------------ 2002. *Language, Ideology and Power, Language Learning Among*

the Muslims of Pakistan and North India, Oxford University Press, Karachi.

---------------- *Language Policy and Localization in Pakistan: Proposal for a Paradigmatic Shift*, http://academic.live.com.

Roy, P. S. (1961). 'Language Planning'. Quest No. 31: Oct-Dec.

Rubin, J. and Jernudd, B.H. (1971). *Can Language be Planned?*, University of Hawaii, Honolulu.

Skutnabb-Kangas; Tove 200. *Linguistic Genocide In Education or Worldwide Diversity and Human Rights*, Lawrence Erlbaum, London.

Tauli, Valter (1964). 'Practical Linguistics: The Theory of Language Planning', In Lunt and Horace (eds.), *Proceeding of the Ninth International Congress of Linguistics*, Cambridge. The Hague & Paris : Mouton.

Weinstain, B. (1980). "Language and Language Planning in Francophone Africa". In *Language Problem And Language Planning*. 4:1, 55-77.

মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষা

মোনায়েম সরকার*

বাংলা ভাষা এক সহস্রাব্দ অতিক্রম করে আরেকটি নতুন সহস্রাব্দের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। শুরু থেকেই বাংলা ভাষার যাত্রাপথ নানা সংকটে আকীর্ণ ছিল– এখনও বাংলা ভাষার আকাশ থেকে সংকটের কালো মেঘ পুরোপুরি সরে যায়নি। প্রতিনিয়তই বাংলা ভাষা নানামুখি চক্রান্তের মুখোমুখি হচ্ছে। সেসব চক্রান্ত ছিন্ন করে বাংলা ভাষা এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সেসব ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই সবচেয়ে সংগ্রামী আর প্রতিবাদী। বারবার বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ এসেছে বারবারই বাংলা ভাষা সেসব আক্রমণ প্রতিহত করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এখনো বাংলা ভাষা তার আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে। যতদিন না বাঙালিজাতি বাংলা ভাষাকে মনে-প্রাণে ধারণ করবে, ততদিন বাংলা ভাষাকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যেতেই হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অবিরাম লড়াই থেকে যেদিন বাংলা ভাষা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সরে দাঁড়াবে সেদিনই তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। তবে আশার কথা হলো বাংলা ভাষা মৃত্যুঞ্জয়। এ ভাষার কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। মাঝে মাঝে ভিনদেশি রাক্ষুসে ভাষা এসে বাংলা ভাষাকে গ্রাস করতে চায় বটে কিন্তু বাংলা ভাষা এমনই এক মৃত্যুহীন ভাষা যে একে কিছু সময়ের জন্য বন্দি করা যায় কিন্তু চিরতরে ধ্বংস করা যায় না। অবিনশ্বর বাঙালি জাতিসত্তার মতো বাংলা ভাষাও অমর, অজর, অক্ষয়।

মুঘল আমলে ফারসি যখন রাজভাষা হিসেবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাংলা ভাষা তার নিজস্ব ভূখণ্ডেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রাজার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার জন্য এই ভূখণ্ডেরই একদল লোক ফারসি ভাষা চর্চা করতে উঠে পড়ে লাগে। আরেকটি দল থেকে যায় দরিদ্র বাংলা ভাষার কাছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজভাষা বাংলা ভাষার উপর চাবুক মারতে থাকে, বাংলাকে গ্রাস করতে চায় কিন্তু পারে না। মরতে মরতে বেঁচে যায় বাংলা ভাষা। মুঘলদের পরে ইংরেজরা এলে বাংলা ভাষার উপর শুরু হয় নতুন অত্যাচার। তখনও বাংলা ভাষার বন্ধনকে উপেক্ষা করে, বাংলা ভাষার মহিমা ভুলে গিয়ে একদল সুবিধাভোগী ইংরেজি ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করে।

*লেখক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিকর্মী

তারা হয়ে ওঠে কালো সাহেব। তাদের ভাবখানা এমন যেন বাংলা তাদের বৈমাত্রেয় বোন। তারা এড়িয়ে চলতে থাকে বাংলা ভাষার সংস্পর্শ। বাংলাকে তারা শুধু অনাদর আর অবহেলা করেই ক্ষান্ত হলেন না তারা বাংলাকে 'ল্যাংগুয়েজ অব ফিসারম্যান' বলতে শুরু করেন। এদের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.)-ও ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর মোহ ভঙ্গ হয় তখন তিনি ঠিকই এসে মুখ লুকান বাংলা ভাষার আঁচল তলে। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম প্রথম ইংরেজি ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনিও অবশেষে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলার কুঁড়েঘরে।

বাংলা ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশমুক্ত হলো তখন আশায় বুক বাঁধে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা ভাবতে শুরু করে তার দুঃখের রাত বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না, নতুন করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় উর্দু নামের এক অদ্ভুত ভাষা। উর্দু বাংলার বিরুদ্ধে এমনই ষড়যন্ত্র শুরু করে যে, বাংলা ভাষার তখন নাভিশ্বাস উঠে যায়। ফারসি ও ইংরেজি ভাষার উৎপাত বাঙালিরা মেনে নিলেও উর্দুর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বলতে গেলে উর্দুর হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার আন্দোলনই বাঙালির প্রথম ভাষা রক্ষাবিষয়ক আন্দোলন। এর আগে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। উর্দুর বিরুদ্ধে চার বছর বাঙালি রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন করে। ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলন শুরু হয় তার প্রাথমিক সাফল্য আসে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এর মাঝে ঘটে যায় অনেক ঘটনা। অনেক প্রাণ বিসর্জিত হয় রাজপথে। জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন অনেক ভাষা সৈনিক। অসংখ্য মানুষের প্রাণদান আর নির্যাতনের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। ১৯৫৪ সালের ৯মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষা প্রথম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ '*চর্যাপদ*'। চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষা বলেই আজ স্বীকৃত। চর্যাপদের ভাষা দিয়েই বাংলা ভাষার বয়স যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখব যে যুগে চর্যাপদ রচিত হয়েছে সে যুগে অভিজাতবর্গের কেউ বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। চর্যাপদ যারা রচনা করেছিলেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পলাতক মানুষ। তারা স্থির হয়ে কেউই বাংলা ভাষা চর্চা করার সুযোগ পাননি। যদি পেতেনই তাহলে শুধু একখানা গ্রন্থ রচনা করেই তারা ক্ষান্ত হতেন না, তাদের হাত দিয়ে আমরা আরো অসংখ্য গ্রন্থ পেতাম। তাছাড়া চর্যাপদ আবিষ্কারের মধ্যেও আছে চমৎকার বিস্ময়। বাংলা ভাষার গ্রন্থ বাংলা ভূখণ্ডে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল নেপালে। কেন বাংলা ভাষার গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হলো– এ সম্পর্কেও নতুন করে গবেষণা হওয়া দরকার।

মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর *নুরনামা* গ্রন্থে বলেছিলেন–

"যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।"

কেন আবদুল হাকিম এ কথা বলেছিলেন তা আজ অনেকেরই জানা। কেননা তখনও একদল বাংলা ভাষা বিদ্বেষী মানুষ ছিলেন যারা বাংলা ভাষাকে মোটেই সুনজরে দেখতেন না। বাংলা ভূখণ্ডে এক শ্রেণির মানুষ বাস করে যারা এদেশের খায়, এদেশের পরে কিন্তু স্বপ্ন দেখে ইরান, তুরান, ইউরোপের, পাকিস্তানের। এরা পরগাছার মতো। এদের ভাষাপ্রেম তো নেই-ই, নেই দেশপ্রেমও। দেশপ্রেম আর ভাষাপ্রেম পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যার দেশপ্রেম থাকে তার ভাষাপ্রেমও থাকে। যার দেশপ্রেম থাকে না, তার ভাষাপ্রেমও লোপ পায়।

যুগে যুগে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে কত রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে তার দুই-একটি নমুনা তুলে ধরতে চাই। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে *'রওশন হেদায়েত'* নামে একটি পত্রিকা তার 'লেখক-লেখিকাগণের প্রতি' নিবেদন করে বলে– "হিন্দুয়ানী বাঙালি না হইয়া দোভাষী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অ-ইসলামিক শব্দ যেরূপ স্বর্গ, নরক, যুগ, ত্রিভুবন, ঈশ্বর, ভগবান, নিরঞ্জন, বিধাতা ইত্যাদি প্রবন্ধে থাকিলে, সে প্রবন্ধ বাহির হইবে না। লেখকগণের খেয়াল করা দরকার, বোজর্গানে দীনে যখন এদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তখন তাঁহারা এদেশের ভাষার মধ্যে ইসলামিক ভাষা প্রবেশ করাইয়া সর্বসাধারণকে ইসলাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'রওশন হেদায়েতে'রও প্রধান উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষা দেওয়া; কাজেই কালামে কুফর প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।" অর্থাৎ যারা মনে করে আরবি, ফারসি, উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা গ্রহণ করলেই বাংলা ভাষার চরিত্র নষ্ট হয় তারা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষার শত্রুই। পৃথিবীতে হাতেগোনা কয়েকটি ভাষা ছাড়া সব ভাষার মধ্যই প্রচুর কৃতঋণ শব্দ আছে। বাংলা ভাষার মধ্যেও প্রচুর কৃতঋণ শব্দ ঢুকে পড়েছে কিংবা বলা যায় নিজের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ ঋণ নিয়েছে।

অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর একটি প্রবন্ধে (বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক নিয়ে হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড) বলেছেন– 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু?'– এই অদ্ভুত প্রশ্নটি তো উনিশ শতকেই উঠেছিল। সে সময়েই তো নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানের মাতৃভাষা যে উর্দু সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তবে নিম্নশ্রেণির যে সব মুসলমান উর্দুকে ঠিক মতো রপ্ত করে উঠতে পারেনি, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি 'মুসলমানি বাংলা'র সুপারিশ করেছিলেন। সেই মুসলমানি বাংলা হবে প্রচলিত বাংলা থেকে আলাদা, সংস্কৃতের বদলে এতে থাকবে সেইসব আরবি-ফারসি শব্দ যেগুলো উর্দু ভাষায় বহু ব্যবহৃত। নবাব আবদুল লতিফরা হয়তো বিশ্বাস করতেন যে, এরকম মুসলমানি বাংলার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে 'আতরাফ' মুসলমানরা এক সময় উর্দুর মঞ্জিলে পৌঁছে 'আশরাফ'দের কাতারে শামিল হয়ে যেতে পারবে।"

নবাব আবদুল লতিফ গংদের মতো এরকম আরো অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা একদিন বাংলা ভাষাকে ঘিরে ধরেছিল। দুর্মর বাংলা ভাষা সেসব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আজ গৌরবের মর্যাদায় আসীন। এখানে অবশ্য একটি কথা না বললেই নয় যে, বাংলা ভাষাই

এশিয়া মহাদেশে প্রথম ভাষা যে ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার মাত্র তেরো বছরের মাথায় এই দুর্লভ পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল ও রক্ত ঝরেছিল, ১৯৯৯ সালে তা মর্যাদা পায় '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*'-এর। সারা পৃথিবীর মানুষ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে জানতে ও বুঝতে শিখছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা খবর। যে ভাষাকে একদিন গলা টিপে হত্যা করার চক্রান্ত হয়েছিল সেই ভাষার সম্মানার্থেই আজ পালিত হচ্ছে '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*'। এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে! তবু দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, এখনো বাংলা ভাষা সর্বস্তরে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ক্রীতদাসেরা এখনও বাংলার বদলে ইংরেজি আওড়াতে বেশি সম্মানিত বোধ করে। প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদিরা এখনও স্বপ্ন দেখে এদেশে আবার ফিরে আসবে উর্দু মিশেল খিঁচুড়ি ভাষা, বাংলাবিদ্বেষী এই কুলাঙ্গারেরা শুধু বাংলা ভাষারই শত্রু নয়, এরা বাংলাদেশেরও শত্রু। এদের যথাযথভাবে প্রতিহত করতে হলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করা এখন সময়ের দাবি। যদিও এই দাবি অনেক আগে থেকেই উঠেছে।

বর্তমান সরকার বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ বান্ধব সরকার। বঙ্গবন্ধুর হাতেই নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্ন-সৌধ। বাংলা ভাষার বৈশ্বিক মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে। যদি আমরা সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষাকে দেশের মাটিতে এবং বিদেশিদের কাছে মূল্যবান করে তুলতে চাই, তাহলে এখনই সুযোগ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটানো– কেননা এমন সুযোগ অতীতে কখনো আসেনি। ভবিষ্যতেও আসবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবী হোক, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হোক আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা : বর্তমান পরিস্থিতি

ড. সৌরভ সিকদার*

ভূমিকা

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলাসহ উত্তরবঙ্গ (সমগ্র রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ), সিলেট বিভাগের চা-বাগানসহ নানা উপজেলা, ময়মনসিংহের শেরপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণাসহ গারো পাহাড়সংলগ্ন এলাকা এবং কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা জেলায় বসবাস করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা। প্রায় ৪০টি ভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী এ ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় এরা নানাদিক থেকে রয়েছে পিছিয়ে বিশেষ করে শিক্ষায় পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যেমন স্কুলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে কম, তেমনি যারা পাচ্ছে তারা সমতলের বাঙালি শিশুর মতো সমঅধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২%-এরও কম হচ্ছে অবাঙালি। ব্রাকের এক গবেষণায় (২০০৬) দেখানো হয়েছে ১.৫% হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সে হিসাবে এদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মোট সংখ্যা ২৫-৩০ লক্ষ। এই ২৫-৩০ লক্ষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যার মধ্যে এক চতুর্থাংশ হচ্ছে শিশু-কিশোর। স্কুলে যেতে পারে কিংবা স্কুলে যাচ্ছে এরূপ চার থেকে দশ বছর বয়সের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। এখানে বলা প্রয়োজন, বাঙালি পরিবারগুলোতে শিক্ষা ও সচেতনতার কারণে পরিবার প্রতি শিশু বা সন্তান গ্রহণ হ্রাস পেলেও অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার এ বিষয়ে ততটা সচেতন নয়, ফলে সেখানে শিশুর সংখ্যা বেশি। যেহেতু এ বিষয়ে কোনো তথ্য-পরিসংখ্যান নেই, কাজেই বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। এমনকি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর শিক্ষার হার কত সে বিষয়েও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউনেস্কো ২০০৩ (*Education Position Paper*, Paris; p.14)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'যাদের মাতৃভাষা জাতীয় বা স্থানীয় ভাষা থেকে ভিন্ন তারা শিক্ষাব্যবস্থায় অনেকটাই সুবিধা বঞ্চিত থাকে'। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুর ক্ষেত্রে এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাংলাদেশে শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর বিষয়ে বিগত দুই দশকে ব্যাপক সাফল্য

*অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এসেছে। ১৯৯০ সালে *সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির* আওতায় বর্তমানে ৯৭% শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, যা ২০১৭ সাল নাগাদ একশত ভাগ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি অর্থসহ নানা সহযোগিতা দিয়ে আসছে EC, UNDP, IDB, ADB, UNICEF-সহ পৃথিবীর অনেক দাতাদেশ ও সংস্থা। অন্যদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চিত্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর স্কুলে গমনের হার (Enrolment rate) অনেক কম, মাত্র ৬৭% (UNDP, CHT Primary Education Technical Report)। কাজেই দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র সহজেই অনুমেয়। আর এ অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটিয়েই সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে স্তরসমূহ রয়েছে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। মূলত সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয় এ বিদ্যালয়সমূহ। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষার্থীর জন্য কোনো পৃথক ব্যবস্থা বা অর্থ বরাদ্দ নেই। ইতিপূর্বে উপস্থাপিত কোনো জাতীয় বাজেটে এই খাতে (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা) পৃথকভাবে কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিল না, যদিও প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অর্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। কাজেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে মূলত উন্নয়ন-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি) আমাদের প্রচলিত জাতীয় শিক্ষাক্রমের (Curriculum) একই পাঠ্যবই (Textbook) অনুসরণ করা হয় এবং এগুলোর ভাষা সঙ্গত কারণেই বাংলা। এসব পাঠ্যপুস্তক মূলত বাংলাভাষী বাঙালি শিশুর পাঠ, বোধগম্যতা এবং মানস-বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবেই তৈরি করা হয়েছে, এগুলো মোটেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুর শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক এবং পাঠ্যপুস্তক জনিত সমস্যার কারণে ঝরে পড়ে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রে বাঙালি শিশুর মতো সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুরা, যা ইউনিসেফ (UNICEF)-এর শিশু অধিকার রক্ষার ধারার স্পষ্ট খেলাপ। এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ অক্টোবর ২০০5) শুধু ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার জন্য ঝরে পড়ে ৩৩% ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশু। আবার প্রাথমিকস্তরে যারা টিকে যায়– তারা তাদের পূর্বপাঠের অপূর্ণতা নিয়ে মাধ্যমিকস্তরে গিয়েও পরীক্ষায় খারাপ ফল করে।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুকে এই শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিগত দুই দশকে শিক্ষার (সাক্ষরতা?) হার বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এর ফলে শিক্ষার হারও বেড়েছে। কিন্তু

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা নেয়া হয়নি, যদিও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা PEDP-II তে সবার জন্য শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সংস্কারের অন্যান্য পালনীয় নীতিমালার আলোকে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ, স্কুলে গমন এবং স্কুলজীবন সমাপ্তির হার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ২০১০ সালে প্রণীত *জাতীয় শিক্ষানীতি* নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুরা কেন পিছিয়ে পড়ছে তার কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ–

(১) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল না-থাকা
(২) মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ না-থাকা
(৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব
(৪) বাঙালি শিক্ষকদের বৈষম্যমূলক আচরণ
(৫) স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই স্কুল পঞ্জিকার বাস্তবায়ন করতে না-পারা
(৬) পাঠ্যবইয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বিষয়ক রচনা না-থাকা
(৭) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও এবিষয়ে সচেতনতার অভাব
(৮) অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত থাকা
(৯) সরকারের বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব
(১০) উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচির সমন্বয় না-থাকা

মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ বিষয়ে জাতীয়/ আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালাসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান ভেদে কোনো ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে সংগতিপূর্ণ, গণভিত্তিক সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরাও সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রাখে। সরকার জাতীয়পর্যায়ে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বাস্তবায়ন করা এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' (Primary Education Development Program-II = PEDP-II) হাতে নেয়। এই কর্মসূচির অধীনে (বর্তমানে চলছে Primary Education Development Program-III = PEDP-III) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুর শিক্ষার উন্নয়ন করতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (২০০৬) সম্পর্কে বলা হয়েছে– (১) স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-জানা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষক নিয়োগ, (২) নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, (৩) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদান,

(৪) পাঠ্যসূচিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংযুক্ত করা, (৫) বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, (৬) স্কুল ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা, (৭) স্কুলের পাঠক্রম তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ করা এবং (৮) স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই স্কুল পঞ্জিকা প্রচলন।

অন্যদিকে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বা PRSP-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা-১৫২-১০৩)-(১) পার্বত্য শান্তি চুক্তি (১৯৯৭)-র পূর্ণ বাস্তবায়ন, (২) প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ এবং সে অনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং (৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার রক্ষার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

২০১৫ সালের মধ্যে সরকার সবার জন্য শিক্ষা (EFA) কার্যক্রম (ডাকার ঘোষণা) বাস্তবায়নে যে অঙ্গীকার করেছে সেখানে মূলস্রোতের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্যও বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে- 'সামাজিক, মানসিক, ভাষাগত কিংবা অন্যান্য দিক নির্বিশেষে সব শিশুকেই স্কুলে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ও প্রতিস্থাপন শিশু, পথশিশু, কর্মজীবী শিশু; প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীগুলোর শিশু; ভিন্ন ভাষা-ভাষী, জাতিসত্তা কিংবা সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশু এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু' (১৯৯৪)।

১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির ৩৩/খ-২ ধারায় বলা হয়েছে- মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কথা। জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মনিরুজ্জামান ২০০৩) রিপোর্টে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারিপর্যায়ে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকায় ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। যদিও এরই মধ্যে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় সরকারি উদ্যোগে অনেকগুলো বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবন-উন্নয়ন ঘটাতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অথচ এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রণয়ন জরুরি। জাতিসংঘ সনদে প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দানের কথা বলা হয়েছে (১২০.১৯৫৭, ১০৭/৩১-১)। শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আর এই ভাষা যদি শিশুর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে না। যেহেতু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুদের মাতৃভাষা বাংলা নয় এবং বিদ্যালয়ে যে বই পড়তে হয় তার ভাষা এবং বিষয় তার পরিচিত পরিমণ্ডলের নয়, এমনকি যে শিক্ষক পড়ান তার সঙ্গেও তাদের রয়েছে ভাষিক দূরত্ব (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)- কাজেই এতসব প্রতিকূলতা পেরিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর শিক্ষার বিস্তার প্রত্যাশিত রূপে ঘটবে তা প্রত্যাশা করা যায় না। আর সম্ভবত এ কারণেই প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর ঝরে পড়ার (drop-out) হার আশঙ্কাজনক।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বৈষম্য কমানো এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে যে সব আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদে স্বাক্ষর করেছে তা হলো–

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) এর অনুচ্ছেদ ২৮-এ বর্ণিত হয়েছেঃ (১) সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার, (২) প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সহজলভ্য করা, (৩) স্কুলে শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার কমানো। ২৯ অনুচ্ছেদে রয়েছে– (১) নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরিতে সহায়তা করা এবং (২) নারী-পুরুষ সমান অধিকারসহ বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত জাতি (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি সমান শ্রদ্ধাবোধ দেখানো। ৩০-সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ 'যে দেশে জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সেখানে তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না'। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯১ সালে এই সনদ অনুসমর্থন করেছে। সনদ অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহ একমত যে, শিশু শিক্ষার মূল লক্ষ্য থাকতে হবে– শিশুর পিতা-মাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা। [২৯-সংখ্যক অনুচ্ছেদ, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)]

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীবিষয়ক আইএলও সনদ নং ১০৭ অনুসমর্থন করে। এ সনদের ২৩-সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, "সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায় পড়ালেখা শেখাতে হবে" (আইএলও ১০৭, ১৯৫৭)। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকারসংক্রান্ত খসড়া জাতিসংঘ ঘোষণা ২০০৬ সালের জুন মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ পাস করেছে। এই খসড়া ঘোষণায় নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও প্রতিবিধান আরোপ করা হয়েছে। যেমন – সাংস্কৃতিক ও মেধাগত সম্পত্তি, শিক্ষা (ধারা ১৪), শিশুশ্রম ও শোষণ [ধারা ১৭ (২)], সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে শিশু সুরক্ষা (ধারা ২২) এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক হত্যাযজ্ঞ। "স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের স্বাধীন, শান্তি ও সুরক্ষিতভাবে জীবনধারণের সামষ্টিক অধিকার রয়েছে ... " [ধারা ৭ (২) আইএসজি, ২০০৬]।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু ও তাদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে জাতীয় পর্যায়েই এমন সব কৌশল, পরিকল্পনা, কাঠামো ও চুক্তি রয়েছে যা দেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি দীর্ঘস্থায়ী মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য যথেষ্ট। বাংলাদেশের সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কৌশলপত্র ও নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে সকল চুক্তির অঙ্গীকার।

জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার রক্ষার ঘোষণায় অনুচ্ছেদ ২৮-এ বলা হয়েছে, সব শিশুর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করতে হবে। সেইসঙ্গে অনুচ্ছেদ ৩০-এ বলা

হয়েছে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর সংস্কৃতি এবং ভাষা অধিকার রক্ষার কথা। আর এর বাস্তবায়ন করতে হলে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ছাড়া সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ২০১৩ সাল থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে (প্রথমে ৫টি, ক্রমান্বয়ে অন্যভাষায়) মাতৃভাষার মাধ্যমে বহুভাষিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেও নানা প্রতিকূলতা ও জটিলতায় বিলম্বিত হতে হতে ২০১৬-এর শেষে এসে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ বছর শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তবে শিক্ষক-প্রশিক্ষণসহ আরো অনেক কাজ এখনো বাকি। কাজেই আমাদের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে তা অবিলম্বে করা দরকার।

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ভাষিক পরিস্থিতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

সুগত চাকমা*

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেশের প্রায় এক দশমাংশ জুড়ে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। প্রায় সমস্ত অঞ্চলটি পাহাড় ও পর্বতময় বলে এর নামকরণ ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরা করেছিল The Chittagong Hill Tracts, যা বাংলায় হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলটিকে একটি নতুন জেলার মর্যাদা দিয়ে চিহ্নিতকরণের সময় প্রথমবারের মতো ঐ নামকরণটি করা হয়েছিল। ব্রিটিশদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায়, ঐ সময় এর আয়তন ৬,৭৯৬ বর্গমাইল ধরা হয়েছিল [Captain T.H. Lewin : 1869]। বর্তমানে এটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত এবং এর আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল [Muhammad, Ishaq, 1971:1]। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশরা অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে চাকমা রাজার অধীন রাঙ্গুনিয়া এলাকাটিকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, তাদের ভাষা, জনসংখ্যা ও বসতি অঞ্চল: ষোড়শ শতকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজারা এবং দক্ষিণদিকে আরাকান রাজ্যের রাজারা রাজত্ব করছিলেন। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোয়াও দ্যা ব্যারোস কর্তৃক অঙ্কিত "ডেসক্রিপকাও রেইনো দ্যা বেঙ্গলা" নামক মানচিত্রটি থেকে জানা যায়, ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের বসতি ছিল। তিনি চাকমাদের নাম লেখেন, "Chacomas" (চাকোমাস) [JASP, vol.viii, no.2.]।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রধান তিনটি নৃগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠী হলো যথাক্রমে – চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সব ক'টি জেলায় রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে এই তিনটি প্রধান নৃগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার হার ছিল ৮৮%।

এ সকল নৃগোষ্ঠীর লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরেও রয়েছে। বাংলাদেশের পূর্বাংশে

*লেখক ও গবেষক। প্রাক্তন পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কোথাও কোথাও ত্রিপুরাদের কিছু গ্রাম আছে। ঐতিহাসিক নানা ঘটনার ফলে ত্রিপুরারা এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের জনসংখ্যা হলো ৪,৪৪,৭৪৮ জন; মারমা ২,০২,৯৭৪ জন এবং ত্রিপুরা ১,৩৪,১৪৫ জন। চাকমারা রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি– এই দুটি জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য লোকেরাও তাদের ভাষা কমবেশি বুঝতে পারে। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সমুদ্রের অনতিদূরে কোনো কোনো এলাকায়ও চাকমারা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল (নেফা) রাজ্যেও চাকমাদের বসবাস রয়েছে। মিজোরামে চাকমাদের নামে একটি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রয়েছে। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিভক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই ত্রিপুরা ও মিজোরাম বা লুসাই হিল্‌স-এ চাকমাদের বসতি ছিল। আর ১৯৬০-এর দশকে অরুণাচলে চাকমাদের নতুন বসতিগুলির পত্তন ঘটে। ঐ দশকে আসামের মিকির হিল্‌স-এও কিছু সংখ্যক চাকমার বসতি গড়ে ওঠে। ভারতে লক্ষাধিক চাকমা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলেও "দৈংনাক" নামে চাকমাদের একটি শাখা রয়েছে। দৈংনাকদের বুড়ো-বুড়িরা এখনও সেখানে চাকমা ভাষায় কথা বলেন। চাকমাদের এই বিস্তৃতি থেকে এই উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে বেশ কয়েকটি রাজ্যে চাকমাদের ভাষার প্রচলন ও প্রভাব দেখা যায়। চাকমারা নিজেদের "চাঙমা' বলে। বর্মি, রাখাইন ও মারমারা চাকমাদের 'সাক' বলে। অতীতে কারো কারো কাছে তারা "চাক্‌মা" "নামের সঙ্গে সঙ্গে "Sakma" (সাক্‌মা) নামেও পরিচিত ছিল। [Francis Buchanan, 1798].

পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা ভাষার সঙ্গে মিয়ানমারের আরাকানি বা রাখাইন ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এ দুটি ভাষা মূলত বর্মি ভাষারই উপভাষা। বান্দরবান জেলায় মারমারাই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি এসব বিষয়ে বর্মি ও রাখাইনদের সঙ্গে মারমাদের ঐসব বিষয়ে গভীর সাদৃশ্য ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এমনকি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে "মগ" নামে আখ্যায়িত লোকদের সঙ্গেও মারমা এবং রাখাইনদের সামাজিক ও ভাষাগত যোগসূত্র রয়েছে।

ত্রিপুরাদের ভাষার নাম হলো "কক-বরক"। অতীতে কোনো কোনো লেখক ত্রিপুরাদের ভাষার নাম "Mrung" [ম্রুং] লিখেছিলেন [Lewin:1869, S. K. Chatterjee]। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে ত্রিপুরাদের কোনো কোনো গোত্র বা দল নিজেদের "ব্রুং" বলে। আর মারমরাই ত্রিপুরাদের "Mrung" [ম্রুং] বলে। এ থেকে ঐ নামটি আসতে পারে। মারমা এবং ত্রিপুরা উভয় ভাষাই সিনো-টিবেটান বা চিনা-তিব্বতি ভাষাপরিবারের টিবেটো-বর্মান বা তিব্বতি-বর্মি শাখার দুটি ভাষা। তবে চাকমাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার ভাষা। এখানে চাকমাদের আরো একটি সহোদরা ভাষা আছে; সেটি হলো তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা। ২০১১ সালে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ছিল ৪৪,২৫৪। তঞ্চঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪৫% ডিগ্রি কোণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলা পর্যন্ত

বিস্তৃত হয়েছে। এমনকি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও তাদের বিস্তৃতি ঘটেছে। আর মিজোরাম রাজ্যেও তাদের কিছু লোকজন রয়েছে। আরাকানের দৈংনাকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট ভাষাগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠীর নাম হলো "ম্রো"। কেউ কেউ তাদের নামের বানান "মুরং" রূপেও লেখেন। অবশ্য তারা নিজেদের "Mo-roo-sa" (মরুসা) বলে থাকে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে ব্রিটিশ অফিসার ফ্রান্সিস বুকানন তাদের নামটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন "Mroo" (ম্রু) [Willium Van Schendel : 1992 : 66]। তাদের ভাষায় এর অর্থ মানুষ। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জনসংখ্যা ৩৯,০০৪ ছিল বলে জানা যায়। [দ্র. নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সম্পাদিত "রেগেক্ষ্যয়ং" ১৯৯৫ : ২৩]। ম্রোরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজ্যের সীমান্তবর্তী উঁচু উঁচু পাহাড়গুলিতে খুমিদের মতো বসবাস করে। বিশ শতকের আশির দশকে মেন্‌লে ম্রো তাদের সমাজে "ক্রামা" নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের মধ্যে একটি নতুন বর্ণমালাও প্রচার করেন। এখন তাদের সমাজে কেউ কেউ মেন্‌লের উদ্ভাবিত বর্ণমালা ব্যবহার করে।

এখানে খুমিদের জনসংখ্যা কম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বান্দরবান জেলায় খুমিদের জনসংখ্যা ৩,৩৬৯। তারা এখনও এতদঞ্চলে জেলা বা উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সিনো-টিবেটান ভাষাপরিবারের টিবেটো-বর্মান শাখার ৫ (পাঁচ)টি ভাষার মধ্যে লুসাই, পাংখোয়া এবং বম নৃগোষ্ঠীদের ভাষা হলো কেন্দ্রীয় কুকি-চিন দলভুক্ত ভাষা। সংখ্যাবিচারে এদের জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে বম ১২,৪২৪, পাংখোয়া ২,২৭৪ এবং লুসাই ৯৫৯। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে লুসাইদের জনসংখ্যা কম হলেও ভারতের মিজোরামে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি। সেখানে স্কুলগুলিতে তাদের ভাষায় রোমান হরফে পড়ালেখা শেখানো হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় কুকি-চিন ভাষাভাষীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় এদের পাওয়া যায় না। বমদের অধিকাংশের বসবাস বান্দরবান পার্বত্য জেলায় হলেও তাদের কিছু লোক ঐ জেলার নিকটস্থ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায়ও বাস করে। এখানকার কুকি-চিন ভাষাভাষী পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে তারাই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর তাদের সমাজব্যবস্থাও বর্তমানে ভালো। পার্বত্য চট্টগ্রামে খুমি ভাষা ব্যতীত দক্ষিণ কুকি-চিন দলের আরো একটি ভাষা আছে। সেটি হলো খিয়াং ভাষা। কেউ কেউ তাদের নামের বানান "খেয়াং"-ও লিখে থাকেন। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান– এই দুইটি পার্বত্য জেলার পশ্চিমাংশে কোনো কোনো এলাকায় তাদের বসতি রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে এই দুটি পার্বত্য জেলায় তাদের জনসংখ্যা ৩,৩৬৯ পাওয়া গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীদের ভাষাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলো চাক ভাষা। তারা নিজেদের "আসাক"/"আচাক" বলে। মিয়ানমারের আরাকানে

তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর স্বল্প সংখ্যক লোক বসবাস করে। সেখানকার কাদু, গানান, মালিন এসব ভাষার সঙ্গে চাক ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের মধ্যে "আন্দো" এবং "ঙারেক" নামে দুটি গোত্র আছে। আবার ভারতের মণিপুর রাজ্যে "আন্দ্রো" নামে একটি জনগোষ্ঠী আছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো চাকদের ভাষার সঙ্গে মণিপুরের আন্দ্রো, সেংমাই এবং চাইরেল– এই তিনটি ভাষারও যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সঙ্গত কারণে জি. এ. গ্রিয়ারসন চাকদের ভাষাকে 'সাক' বা লুই' দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। [Grierson : 1927]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুভাষিক পরিস্থিতি ও দ্বিভাষিকতা

আঠারো শতকের প্রারম্ভেও পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিল। মোগলদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায়, ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন চাকমারাজা তাদের ১১ মণ কার্পাস বা তুলা শুল্ক হিসেবে দিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তারা সমতলের ব্যাপারীদের পার্বত্য বা পাহাড়ি মানুষদের সঙ্গে কতকগুলি জিনিস নিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুমতি দেন [A. M. Serajuddin : 1971]। সেই থেকে এদিকের অঞ্চলটি মোগলদের কাছে "কার্পাস মহাল" নামে আখ্যায়িত হতে শুরু করেছিল। সে সময় ব্যাপারী বলতে চট্টগ্রামের ব্যাপারীরাই ছিল। তাদের লেনদেন প্রধানত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের সঙ্গে ছিল। এতে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে *লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা* ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঐ শতকেই এখানকার প্রাগ্রসর নৃগোষ্ঠী চাকমাদের কেউ কেউ মহাভারত, রামায়ণ, বিদ্যাসুন্দর, গোরক্ষবিজয়, জ্ঞানপ্রদীপ এসব বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছিল। চাকমাদের চারণকবি গেংগুলীদের গানে এবং চাকমা বর্ণে অনুলিপিকৃত কোনো কোনো বই থেকে সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। এ জাতীয় প্রভাব মারমা বা অন্যদের বেলায় ঘটেছিল কি-না অদ্যাবধি জানা যায়নি। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা এবং চাক নৃগোষ্ঠীর লোকেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের নিজস্ব বৌদ্ধভিক্ষু আছেন। চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। তাদের বৌদ্ধভিক্ষুরা স্ব স্ব বর্ণে পালিভাষায় তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলি লিখতেন ও পাঠ করতেন। ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের সমাজে কখনো কখনো কোনো কোনো বৈষ্ণবকে দোতারা বাজিয়ে আধ্যাত্মিক গান করতে দেখা যায়। এতে এদের কিছু প্রভাব পড়ে থাকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃগোষ্ঠীদের মোট জনসংখ্যা হলো ৮ লাখ ৯০ হাজার ৮৮৫ আর বাংলাভাষীদের সহ মোট জনসংখ্যা হলো ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ১৪১। [দ্র. নবকিশোর ত্রিপুরা : ২০১৫ : ২৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্রই স্কুলগুলিতে পড়ালেখার প্রধান মাধ্যম হলো বাংলা, যদিও ইংরেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। এখানে অফিস, ব্যাংক (আদালতের ভাষাও) বাংলা। তবে কলেজগুলিতে ইংরেজিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬০-এর দশকে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে তার মাধ্যমে বাংলার প্রভাব নৃগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে বিশেষত প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে বিস্তার লাভ

করতে শুরু করেছিল এবং পরবর্তীকালে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা সহোদরা হওয়ায় তারা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে। চট্টগ্রামী ব্যাপারী বা ব্যবসায়ীরাও একটু আধটু চাকমাদের কথা ব্যবসার প্রয়োজনে বুঝতে পারে। ত্রিপুরা এবং মারমারাও নানা কাজে ও উপলক্ষে চাকমাদের ভাষা কমবেশি বুঝতে পারে। লুসাই, পাংখোয়া এবং বম নৃগোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে। উল্লেখ্য যে, তারা সবাই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। আর প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই খ্রিস্টান মিশনারিরা রোমান হরফে লুসাই ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, ডিকশনারি প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ মিজোরামে করেছিল। লুসাই ভাষার মাধ্যমে এর প্রভাব সমগোত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে এখনও বিদ্যমান। অতীত থেকে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মারমা ভাষার প্রভাব অন্যান্য নৃগোষ্ঠীদের ভাষাগুলির উপর কমবেশি পড়ছিল। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাক জাতীয় লোকদের ভাষায় বহু মারমা শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। খিয়াংদের একাংশ সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের মধ্যেও ঐ জাতীয় প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। তবে যোগাযোগের ব্যাপারে আন্তঃনৃগোষ্ঠীর মধ্যে অতীত থেকে বরাবরই কমবেশি দ্বিভাষিকতা ছিল। আর উনবিংশ শতাব্দী থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অফিস-স্কুলগুলিতে বাংলা (ইংরেজির সঙ্গে) মিডিয়াম ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমশ এখন ত্রিভাষিকতা কিংবা বহুভাষিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদর্শিত নানা চ্যানেল বা অনুষ্ঠানগুলিও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

নৃগোষ্ঠীদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং তাদের ভাষার বিপন্ন অবস্থা

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের প্রধান ভাষাগুলি সুরক্ষার পথে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এর ফলে তাদের নিজেদের ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। তবে বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ) ও তৎপর (আশির দশক) থেকে জুম এসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক) ইত্যাদি সংগঠনগুলি তাদের ভাষায় বাংলা বর্ণকে ব্যবহার করে এখানকার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। ইদানীং ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা বইপুস্তক ছাপানো হচ্ছে।

১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নানামুখি উপজাতীয় সংস্কৃতি বিশেষত তাদের ভাষায় সঙ্গীত, বর্ণাঢ্য নৃত্য, বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়ন করে দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দান করছে। সেই সঙ্গে ৪৫০-এরও অধিক প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক-শিক্ষিকাকে চাকমা বর্ণে ও ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এতে চাকমা ভাষায় পাঠদানের প্রাথমিক কাজ কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছে। বর্তমানে বান্দরবানে ও খাগড়াছড়িতে আরো দুটি একই জাতীয় ইনস্টিটিউট কাজ করছে। তারাও নানা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে তারা বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে চাকমা, মারমা ও ককবরক

ভাষায় প্রকাশিত অভিধান, শব্দকোষ ও ব্যাকরণ ইত্যাদি রয়েছে। এগুলি তাদের ভাষা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক গ্রন্থ।

ইতিমধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলায় যে তিনটি (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে তাদের জন্য প্রণীত আইনগুলিতে প্রদত্ত তফসিলের মাধ্যমে "মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান" বিষয়টি তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশীয় ও স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা কাজ করছে। ২০০৮ সালে ইউএনডিপি-সি.এইচ-টি-ডি-এফ পার্বত্য চট্টগ্রামে "সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন" প্রোগ্রামের আওতায় ৭ (সাত)টি উপজাতীয় ভাষা ব্যবহারে সহযোগিতা দান করেছিল। এতে আশা করা যায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই অন্যান্য ভাষাগুলিরও উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। বিশেষত ইউনেস্কোর একটি ওয়েভ সাইটে প্রচারিত বিপন্ন ভাষাসমূহের তালিকায় এখানকার চাক (সাক্) এবং বম ভাষার নামও রয়েছে। তবে, যদিও ঐ তালিকায় বম ভাষাটির নাম বিপন্ন ভাষা হিসেবে দেখা যায়, কিন্তু তাদের ভাষার এখন কিছু কিছু অগ্রগতি হচ্ছে। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটসহ ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও নানামুখি উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে একথা বলতে হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত অমূল্য মানবসম্পদ হওয়ার বিবেচ্য। এসব ভাষায় অসংখ্য চিত্তাকর্ষক ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ঘুমপাড়ানি গান, ছড়াগান, আধুনিক গান, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কাহিনি, ব্যালাড ইত্যাদি সাহিত্যের বহু অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে যেগুলি প্রকাশিত হলে নিশ্চিতভাবে দেশের বৃহত্তর সাহিত্যভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের এই মূল্যবান ভাষাগুলিও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এই একুশ শতকে উন্নতি অর্জনের মাধ্যমে দেশের ভাষাগৌরবকে আরো বৃদ্ধি করবে।

এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি বাংলাদেশে কেবল "শহীদ দিবস" হিসেবেই শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবেও পালিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে পালিত হচ্ছে। আর এই একুশ শতকে পৃথিবীর ভাষাসমূহের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যাপারে ভাষাবান্ধব দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রয়েছে পৃথিবীতে সবার শীর্ষে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (১৯৯৫) সম্পাদিত "*রেগেক্ষ্যয়ং*" ঢাকা।

——(২০০১) সম্পাদিত। "*বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনজাতি*", বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত।

শাওন ফরিদ (২০০৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য*। রাঙ্গামাটি।

সুগত চাকমা (১৯৮৮)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা*। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

——(২০০২) : *বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য*। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। *ত্রিপুরা বা ককবোরক ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ*। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

A. M. Serajuddin. (1971). "The Rajas of the Chittagong Hill Tracts and Their Relations with the Mughals and the East India Company in the Eighteenth Century" published in *The Journal of the Pakistan Historical Society*. Karachi.

Fazle Rabbani. (2004). *Atlas of the Languages and Ethnic Communities of Chittagong Hill Tracts*, Dhaka: UNESCO office. George A. Grierson (compiled), *Linguistic Survey of India*, vol. I, part I (Calcutta 1927), vol II, vol III, vol V, Part I (Calcutta 1903).

S. K. Chatterji, (1974), *Kirata Jana Krti*. (2nd ed.). Calcutta.

T.H. Lewin. (1869). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein*. Calcutta: Bengal Printing Company Ltd.

Varena Reichle. 1981 : *Bawm Language and Lore*. Las Vegas : Peter Lang.

Willem van Schendel. (1798). Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798), Dhaka : The University Press Ltd.

Joao de Barros's map. *Descripcao de Reino de Bengala* (Edited by Baptista Lavanha in about 1550) DA ASIA DE JOAO DE BARROS, LISBOA. Na Regio officinal Typogracica Anno MDCCLXXVII 1973.

The Map Scroll: Endangered [http: map scroll. Blog spot. Com / 2009/02/endangered – languages, htm]

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার।
এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মুত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু ?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মুত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল ?
ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

২৬/০২/১৯৫২
(কবির স্বহস্ত লিখিত পাঠ থেকে)

একুশের ভাষা আন্দোলন এবং এদেশের প্রান্তিকায়িত অন্যান্য ভাষা

এ কে শেরাম*

প্রায় দুই শ' বছরের ব্রিটিশ আধিপত্যের জিঞ্জির ছিঁড়ে ভারতবর্ষ যখন দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা পেল, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তখনই জন্ম নিল পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামের পৃথক দুই ভূখণ্ডের দেশ 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রটি। জন্মের পরপরই শুরু হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্ক এবং তারই সূত্র ধরে রচিত হয় এক সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের পটভূমি। উনিশ শ' সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি। বাংলা ছিল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ভাষা এবং জনমতকে উপেক্ষা করে উনিশ শ' আটচল্লিশের প্রথম দিকেই ঘোষণা আসে মুষ্টিমেয় মানুষের মুখের ভাষা উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। স্তম্ভিত হয় বাঙালিরা এবং তার সাথে প্রায় সমগ্র দেশও। ভাষার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন-সংগ্রাম। তবে বাঙালিদের দাবিটি ছিল উদারনৈতিক এবং যৌক্তিক। তারা দাবি করেছিল, একমাত্র উর্দু নয়, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে করাচিতে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র পরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সংশোধনী আনেন যে, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক (সুনির্মল : ২০০১ : ৭৭)। কিন্তু যৌক্তিক সে দাবি উপেক্ষিত হয়, পদদলিত হয় অধিকাংশের মতামতও। মাতৃভাষার প্রশ্নে শুরু হয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের রাজনীতি। উর্দুকে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা আর বাংলাকে হিন্দুয়ানী ভাষার তকমা পরিয়ে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় জোশ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাকে অগ্রাহ্য করে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস পায় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু মাতৃভাষা হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ অহংকার। জন্মদাত্রী জননীর প্রতি বা দেশমাতৃকার প্রতি যেমন সন্তানের থাকে তীব্র আবেগ, তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও থাকে এক সুতীব্র আবেগী চেতনা। আবেগের এই তীব্রতার কারণেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তান সরকারের অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি বাঙালি জনগোষ্ঠী। আর তাই, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভালোবাসার এই অবিনাশী চেতনায় ভেসে সেদিন, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্যে

*বিশিষ্ট গবেষক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নেতা

নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার কোটি সন্তানকে ছাপিয়ে হঠাৎ উঁচু হয়ে ওঠা বাংলার দীর্ঘকায় আলোকিত মানুষেরা–রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউর প্রমুখ; রক্তগোলাপের মতো থোকা থোকা ফুটে ওঠা একগুচ্ছ নাম। অবশেষে রক্তের মূল্যে অর্জিত হয় মাতৃভাষা-বাংলার ন্যায্য অধিকার।

আমরা জানি, মানুষের প্রথম স্বজন তার মা হলেও দ্বিতীয় স্বজন তার মাতৃভূমি, যে তাকে মায়ের মতোই লালন করে–পালন করে মাতৃস্নেহে। আর তাই মানুষের মা যেমন দু'জন–জন্মদাত্রী জননী আর দেশমাতৃকা, তেমনি কখনো কখনো মানুষের মাতৃভাষাও থাকে দু'টো–জন্মদাত্রী জননীর ভাষা আর দেশমাতৃকার ভাষা। বাংলাদেশে বাঙালির পাশাপাশি যেসব জাতিসত্তার বাস, তাদের জন্যে দেশমাতৃকার ভাষা বাংলা হলো দ্বিতীয় মাতৃভাষা। আর সে-কারণেই মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সেদিন অসঙ্কোচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তারাও। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন করে জেগে ওঠে বাঙালির জাতীয়তাবোধ, 'একুশে ফেব্রুয়ারি' হয়ে ওঠে 'মাথা নত না করার' অন্য নাম। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র এই অমোঘ শক্তি বাঙালির পরবর্তী ইতিহাসের সকল অগ্রগামিতার মূল চালিকাশক্তি হয়েছে, জাতির ইতিহাস-শকটকে নানা ধাপ ও স্তর পেরিয়ে শেষাবধি পৌঁছে দিয়েছে প্রত্যাশার তুঙ্গশীর্ষ সীমানায় স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপত্যকায়।

এই ইতিহাস আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। আমরা এও জানি, মানবেতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্যে, ধর্মের কারণে আত্মোৎসর্গের অসংখ্য ঘটনা ঘটলেও মাতৃভাষার জন্যে এই আত্মদান ছিল ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের মাধ্যমে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার জন্যে আত্মাহুতির অনন্য ইতিহাস 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আজ *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*। সারা বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠী এই দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে একুশের চেতনা থেকে গ্রহণ করবে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে অধিকতর ভালোবাসার অনন্ত অনুপ্রেরণা।

আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা বাঙালি এবং প্রধান ভাষা বাংলা। বাংলা এদেশের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বাঙালি ছাড়াও এদেশে যেমন অনেক সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তার বাস, তেমনি বাংলার পাশাপাশি এসব ভিন্ন জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা হিসেবে অনেক ভাষার অস্তিত্বও বিদ্যমান। এই জনগোষ্ঠীগুলো, যারা নিজেদেরকে 'আদিবাসী' অভিধায় সংজ্ঞায়িত করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন অথচ রাষ্ট্র তাদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বা 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' এরকম নানা শিরোনামে চিহ্নিত করে থাকে, এদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে এদের সংখ্যা ৪৫টি (সংহতি : ২০০০ : ১৩৩)। বিজ্ঞজনদের মতে, এইসব সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তার মধ্যে ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত (সৌরভ : ২০০৮ : ২৮)। তবে অনেকের মতে এই ভাষার সংখ্যা আরো অনেক বেশিই

হবে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ভাষার যেমন এক দীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস আছে, তেমনি আছে লিখিত সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও। বাংলাদেশের এইসব ক্রমশ প্রান্তিকায়িত ভাষাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ১৫টি ভাষার লিখিত সাহিত্যচর্চার ইতিহাস আছে বলে আমরা জানি। এগুলো হলো: চাকমা, সান্তালী, মণিপুরী, গারো, ত্রিপুরা, মারমা, রাখাইন, খাসি, বম, ম্রো, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী, হাজং, কুড়ুখ, মাহালী ও অসমিয়া বা অহমিয়া। আবার এই ভাষাগুলোর মধ্যে অন্তত ৬টি ভাষার নিজস্ব লিপি পদ্ধতিও আছে। এগুলো হলো– চাকমা, মণিপুরী, মারমা, সান্তালী, রাখাইন ও ম্রো ভাষা। চাকমা লিপি ইতোমধ্যে ইউনিকোডের আওতায়ও এসেছে। ইতিহাস বা উৎকর্ষের বিচারেও অনেক ভাষা যথেষ্ট প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মণিপুরী ভাষা খুবই প্রাচীন; খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে লিখিত মণিপুরী সাহিত্যের নমুনা পাওয়া গেছে এবং উৎকর্ষের বিচারেও মণিপুরী সাহিত্য যথেষ্ট অগ্রসর; পূর্ব-ভারতে এর অবস্থান তৃতীয়– বাংলা এবং অসমিয়া ভাষার পরেই। আবার মণিপুরী, অসমিয়া এবং সান্তালী ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সর্বভারতীয় পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হলেও ভাষাভাষীর সংখ্যা এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিবেচনায় আরও বেশ ক'টি ভাষাকে সেখানে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরকম ভাষার সংখ্যা ২২টি; এগুলোর মধ্যে হিন্দির পাশাপাশি বাংলা, মণিপুরী, অসমিয়া ও সান্তালী ভাষা আছে। এই চারটি ভাষার কথা উল্লেখ করার কারণ বাংলাদেশেও এই চারটি ভাষা প্রচলিত। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মণিপুরী ভাষা সেই প্রাচীনকাল থেকেই মণিপুর রাজ্যের রাজ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। ভারতের সাহিত্য একাডেমি কর্তৃকও এই ভাষা স্বীকৃত এবং প্রতিবছর এই ভাষার কোনো না কোনো সাহিত্যকর্ম সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়। তাছাড়া মণিপুরসহ ভারতের বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়েও মণিপুরী ভাষায় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ আছে।

বর্ণিত অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ২২টি ভাষার বাইরে ভারতের ২০০১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে দশ হাজার বা তার চেয়েও বেশি লোক কথা বলে এরকম আরও ১০০টি ভাষা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যদিও ওই রিপোর্টে ভাষা ও উপভাষা মিলে ভারতে মোট ৬,৬৬১টি ভাষার অস্তিত্ব আছে বলে উল্লিখিত হয়েছে (*Census of India : 2001 : 2*)। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয় বা 'নন-সিড্যুলড' ভাষার উক্ত তালিকায় ওরাঁও, ত্রিপুরী বা ককবরক, খাসি, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী, কোচ ইত্যাদি ভাষা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে বাংলা প্রধান ভাষা নয়, এর উৎকর্ষ এবং অন্তর্গত ঐশ্বর্য ও উজ্জ্বল অবস্থানের কারণে পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো প্রক্ষেপিত হয়েছে কেবল এই ভাষারই উপর– আর বাকি ভাষাগুলো থেকে গেছে পাদপ্রদীপের অন্তরালে। কিন্তু যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হোক, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে নিজ নিজ মাতৃভাষাই ভালোবাসার আঙরাখায় মোড়ানো প্রিয়তম ভাষা। প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা স্মরণে আনতে পারি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপনের কথা– যেখানে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ভাষার

জন্যে আত্মদানের এই মহান দিবসটি উদ্‌যাপিত হয় এক ভিন্ন আঙ্গিকে– 'ভাষা দিবস' নামে। ত্রিপুরার রাজ্যভাষা এবং প্রধান ভাষা বাংলা। কিন্তু তারপরও ভাষা দিবসের সকল কর্মকাণ্ডে সরকারিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে রাজ্যের প্রায় সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে। সরকারি অনুষ্ঠানমালায় বা প্রকাশনায় বাংলা ছাড়াও রাজ্যের অন্তত পাঁচটি প্রধান ভাষাকে, যেমন– ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী ও হালাম-কুকি ভাষা ও সাহিত্য যেমন স্থান পায়, তেমনি সামগ্রিক অনুষ্ঠানমালায় সম্মিলন ঘটে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সেখানে নানা ভাষা ও জনগোষ্ঠীর জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অনুপম মেলবন্ধন ঘটে। একুশে ফেব্রুয়ারি '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*' হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি বস্তুত সেই চেতনারই বৈশ্বিক রূপায়ণ। সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের প্রধান এই পাঁচটি ভাষার উন্নয়নে যথাযথ সরকারি ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এইসব ভাষার জন্যে একটি পৃথক অধিদপ্তর চালু করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে বাঙালির পাশাপাশি বসবাসরত চাকমা, গারো, মণিপুরী, মারমা, ত্রিপুরা, খাসি, সান্তাল, রাখাইন প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে বহুলাংশে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত, যদিও এদের প্রায় সকলেরই রয়েছে এক সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ফলে বাংলা ভিন্ন এদেশের অন্য ভাষাগুলো সাংবিধানিক, সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের স্বীকৃতিবিহীন অবস্থায় অবহেলায়-অবজ্ঞায় ক্রমশ ক্লিষ্ট হতে হতে আজ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনেস্কো পৃথিবীর বিপন্ন ভাষাগুলোকে ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে। এগুলো হলো– 1. Vulnerable, 2. Definitely endangered, 3. Severely endangered এবং 4. Critically endangered. আর *Wikipedia*-য় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক ভাষাই এখন Definitely endangered বা Severely endangered পর্যায়ে। আসলে বাংলাদেশের বিশাল প্রসেনিয়ামে উজ্জ্বল স্পটলাইট পতিত হয়েছে কেবল বাঙালি এবং বাংলা ভাষার উপরেই। আর অন্যান্য নৃগোষ্ঠী এবং তাদের ভাষাগুলো থেকে গেছে উপেক্ষার কুয়াশা-আঁধারে। স্বজন বান্ধবহীন এই ভাষাগুলো তাই ক্রমাগত অভাব আর অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ছে। আর এই প্রেক্ষাপটে আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং তাদের মাতৃভাষার প্রতি পরিপূর্ণ আলোক প্রক্ষেপণের– পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত করার। আর 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র মৌল চেতনাও তাই। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন কেবল বাংলা ভাষার আন্দোলন ছিল না, ছিল মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সেকারণেই সেদিন দাবি উঠেছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার। অন্য ভাষার বিরোধিতা করা বা কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করা 'একুশে'র লক্ষ্য ছিল না, একুশের মৌল চেতনা হলো সকল মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ তো সেই দেশ, যে দেশ মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বিশ্বে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল; 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র যে অনির্বাণ শিখা আন্দোলন-সংগ্রামের ক্রম-অগ্রগতির পথ বেয়ে একদিন জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিল স্বাধীনতার অনন্ত আলোকিত প্রান্তরে। বাঙালির মাতৃভাষাকে ভালোবাসার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র যে অম্লান চেতনা তা বিশ্ব-মননকে স্পর্শ করে আজ '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*'; যে দিবসের মৌল প্রণোদনাই হলো বিশ্বের প্রতিটি ভাষা, যা কোনো-না-কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, তাকে ভালোবাসার আঙরাখায় মুড়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তার চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। এই দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র ও সরকারের এবং তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় বলয়ে অবস্থানকারী দেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর। কিন্তু যে দেশ 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র মতো এক অনন্য ইতিহাস আর '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*'-এর অপরিসীম গৌরবের উদ্‌গাতা সেই বাংলাদেশে এখনও বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষাগুলোর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি স্বীকৃতি যেমন নেই, তেমনি নেই বিশেষ কোনো পৃষ্ঠপোষণাও। ভাষার মাসকে কেন্দ্র করে জাতির মননচর্চার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিতে প্রায় মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠিত হয় ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সভাও। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানমালায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের কোনো অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি নেই। আসলে এদেশের সরকার বা জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো এইসব ভাষা ও সাহিত্যের আগে তেমন কোনো খোঁজখবর করেনি। তবে সেই প্রবণতা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। বর্তমানে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মসূচি, উদ্যোগ ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞজনদের সম্পৃক্ত করতে। বিশেষ করে সরকারিভাবে '*আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট*' প্রতিষ্ঠা ও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা সংখ্যাস্বল্প জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষার প্রতি জাতীয় আলোক-প্রক্ষেপণের উদ্দেশে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম আলোর রেখা আজ দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে, তাতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলই নিঃসন্দেহে একটু আশান্বিত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, এই প্রাণসঞ্চারী আলোর রেখা ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এবং এই আলোয় একদিন আলোকিত হবে সমগ্র জাতিও। আর এই ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকেই– আর সহযোগিতার কল্যাণী হাত বাড়িয়ে অগ্রজের মহান ঔদার্যে এগিয়ে আসতে হবে এদেশের প্রাগ্রসর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে।

সূত্রনির্দেশ

১. সুনির্মলকুমার দেব, *মীন (২০০১), একুশই বিশ্ব মাতৃভাষা*, সিলেট।

২. দ্রং, সঞ্জীব (সম্পাদক), *সংহতি* ২০০৬, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ৯ আগস্ট ২০০৬।

৩. সৌরভ সিকদার ও মথুরা ত্রিপুরা, *সংহতি ২০০৮*, "পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা : বাস্তব অবস্থা ও করণীয়", বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ৯ আগস্ট ২০০৮।

৪. *Census of India 2001*; Paper 1 of 2007, LANGUAGE; Office of the Registrar General, India.

মাতৃভাষা

কামাল চৌধুরী

আমার প্রথম চিৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রপিতামহের অক্ষর
আমার প্রথম চিৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছে মাতৃদুগ্ধরূপী বর্ণমালা
আমার প্রথম চিৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছে অ আ ক খ ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আমার প্রথম চিৎকার থেকে বেরিয়ে এসেছো তুমি, হে আমার বাংলা ভাষা

তোমার হাতে আমি তুলে দিয়েছি অবগাহনের উন্মুখর জলরাশি
প্রতিটি নদীর জলে, স্রোত ও সঙ্গম মুখে আমি তোমারই কোলাহল
আমার পতাকার রঙে, আমার ধূলি ও বৃষ্টিগাথায়
অসামান্য সবুজের মর্মরিত উচ্চারণে তুমি
তোমার স্তবগানে
পাখিদের ঠোঁটে প্রতিদিন উড়ে আসছে আমার ঊষাকাল

তোমাকে ভালোবেসে আমি উড়িয়ে দিয়েছি রক্তাক্ত জামা
শহীদ মিনার থেকে উড়ে উড়ে সেই রক্ত কথা বলছে মানুষের মাতৃভাষায়
পৃথিবী কথা বলছে বরকতের ভাষায়
পৃথিবী কথা বলছে সালামের ভাষায়
পৃথিবী কথা বলছে রফিকের ভাষায়
পৃথিবী কথা বলছে জব্বারের ভাষায়

সারাটা পৃথিবী আজ শহীদ মিনার
সারাটা পৃথিবী আজ মিশে গেছে প্রভাতফেরিতে

তোমার মৃত্যু নেই, হে আমার মাতৃভাষা।

১০/০২/২০১৭

একুশের চেতনা, আমাদের ভাষা পরিস্থিতি ও মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা*

ফেব্রুয়ারি প্রবল স্মৃতিকাতরতা ও আত্মআবিষ্কারের মাস। এ মাস এলে কেবল বাঙালি নয়, দেশের সকল মানুষ আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালের পর দেশজ এই আবেগ সংক্রামিত হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন একুশ এলে 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সুরের মূর্ছনা অনুরণন তোলে দুনিয়ার নানা কোণে। মায়ের ভাষার প্রতি নাড়ির টান চিরন্তন। একুশের চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, বহুত্ববাদের স্বীকৃতি এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে মুক্তির বার্তা। বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন আপাতদৃষ্টে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন হলেও সে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল আরো ব্যাপক। এটি ছিল প্রভাবশালী দাম্ভিক ভাষার বিপরীতে তৃণমূল জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি। এটি কেবল উর্দুর বিপরীতে বাংলার আন্দোলন নয়, এটি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মেহনতি মানুষের মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। রক্তরাঙা একুশের পর অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি অন্যান্য প্রান্তজনের ভাষাগুলোরও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা পাওয়ার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার ভাষা হিসেবে একাধিক ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিতে পারি। একুশের পথরেখা অনুসরণ করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তাই একুশ 'বাংলাদেশ' নামে আমাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মের সূতিকাগারও বটে।

কিন্তু দিন যতই আধুনিকতার লাগামহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই শিথিল হয়ে চলেছে একুশের চেতনা। একুশ এখন অনেকটা ফ্যাশন হাউজের আয় বাড়ানোর উৎসে পরিণত হয়েছে। একুশ এলে রক্তস্নাত সেই একুশের চেতনা নানা রঙের ফুল আর রঙিন শাড়ির বাহারি ডিজাইনের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। বর্তমান প্রজন্মের ভাষা চর্চার উপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে- এটিই স্বাভাবিক ও চিরন্তন প্রক্রিয়া। এটিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই

*নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি

গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া কেবল নিজেরটা বর্জন করে এবং অন্যেরটা গ্রহণের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়লে তা ডেকে আনে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। আমরা যেন দিন দিন সেদিকেই ঝুঁকে পড়ছি অতিমাত্রায়। পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাও এই রাহুগ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। পুঁজির দাপটে নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে বাংলাকে। এক শ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির নিজস্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার মতো হঠকারিতা বাংলা ভাষার অগ্রগতিকে কোণঠাসা করে রেখেছে সবসময়। তবে এটাও সত্যি যে, একদিন সেসব পুঁজির পূজারীদেরকে অবশ্যই বাধ্য হয়ে বলতেই হবে 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাই পৃথিবীর সেই সবচেয়ে দাপুটে ভাষা, যে ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্যে বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ এবং রক্তের পথরেখা অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। নিজের জীবন দিয়ে মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি নেই। বাংলার দামাল ছেলেদের এই আত্মবলিদান কেবল নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এই বলিদানের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত ছিল। আর সে কারণেই তো এই ভাষার পথরেখা অনুসরণ করে 'একুশে' আজ পৃথিবীর প্রায় দুইশত দেশে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় একই দিনে।

বাংলার কিছু উদ্যমী তরুণের উদ্যোগে দাবি উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্যে ঘোষণা করা হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক এই ঘোষণার পর সীমিত পরিসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে থাকে। পরে ২০১০ সালের ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সকলের সম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন করে নিজের মায়ের ভাষার প্রতি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে অগ্রগামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে বায়ান্নে যে ভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা প্রাণ দিয়েছিল, সেই বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী পথপ্রদর্শক হিসেবে সকলের কাছে সম্মানিত হয়েছেন। এই স্বীকৃতি পৃথিবীর সকল বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সুরক্ষা ও বিকাশে বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাত্রাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

বাঙালিজাতির পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লক্ষের মতো নানা ভাষা ও জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। এরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ। দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে তারা বসবাস করে। তিন পার্বত্য জেলায়– খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে অধিকাংশ জাতিসত্তার মানুষের বসবাস হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, গাজীপুর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলেও তাদের বসতি রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো মোটামুটি

চারটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারেই কথা বলে; অস্ট্রিক, চিনা-তিব্বতি, ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড় ইত্যাদি। অস্ট্রিক ভাষাপরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– খাসি, কোদা, মুন্ডারি, প্লার, সান্তালি, ওয়ার-জৈন্তিয়া। চিনা-তিব্বতি বা তিব্বতি-বর্মি ভাষাপরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হলো– আতং, চাক, আশো, বম, গারো, হালাম, হাকা, খুমি, কোচ, ককবরক, মারমা, মেগাম, মৈতৈ মণিপুরী, ম্রো, পাংখোয়া, রাখাইন অন্যতম। ইন্দো-আর্য ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে– অহমিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী, চাকমা, হাজং (পূর্বে তিব্বতি-বর্মি ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল), সাদ্রি (ওরাঁও), তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি। দ্রাবিড় ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত দু'টো ভাষা হলো কুড়ুখ ও সাউরিয়া পাহাড়িয়া।[১]

ভাষার অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশকে ১১টি অঞ্চলে বিভাজন করা যায়। যথা– (১) বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল– ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ইত্যাদি; (২) গাজীপুর; (৩) উপকূল অঞ্চল– পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার; (৪) বৃহত্তর সিলেট– সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম– রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (৬) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল– যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা; (৭) উত্তরবঙ্গ– রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর; (৮) বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল– চট্টগ্রাম, কক্সবাজার; (৯) বৃহত্তর কুমিল্লা– চাঁদপুর ও কুমিল্লা; (১০) রাজবাড়ী এবং (১১) ফরিদপুর।

অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন জাতিসমূহের অবস্থান হলো।[২] যথা– (১) বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ইত্যাদি) গারো, হাজং, কোচ, বর্মন, ডালু, হদি, বানাই, রাজবংশী ইত্যাদি; (২) গাজীপুর অঞ্চলে বর্মন, কোচ, গারো ইত্যাদি; (৩) উপকূল অঞ্চলে (পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার) রাখাইন; (৪) বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ইত্যাদি) মণিপুরী, খাসি, গারো, হাজং, পাত্র, খাড়িয়া, সাঁওতাল, ওরাঁও, ত্রিপুরা ইত্যাদি; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা) অহমিয়া, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, গোর্খা, চাক, পাংখোয়া, খুমি, সাঁওতাল, গারো, খ্যাং ইত্যাদি; (৬) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা) বাগদি/বুনো, রাজবংশী, সাঁওতাল ইত্যাদি; (৭) উত্তরবঙ্গে (রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর) সাঁওতাল, ওরাঁও, মুন্ডা, মালো, মাহালি, খন্ড, বেদিয়া, ভূমিজ, কোল, তুরি, কর্মকার, মাহাতো, মুরিয়ার, মুশহর, পাহান, পাহাড়িয়া, রাই, সিং ইত্যাদি; (৮) বৃহত্তর চট্টগ্রামে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা,

---

[১]Tripura, Mathura Bikash, "Indigenous Peoples of Bangladesh and Their Languages: Multilingual Education in Government Education System," INTERNATIONAL EXPERT GROUP MEETING, United Nations, New York, 19-21 January 2016

[২]বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২০০২, টেরি ডারনিয়ান ২০০৭, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ২০১৩

রাখাইন, ত্রিপুরা ইত্যাদি; (৯) বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে (চাঁদপুর ও কুমিল্লা) ত্রিপুরা; (১০) রাজবাড়ী অঞ্চলে ত্রিপুরা এবং (১১) ফরিদপুর অঞ্চলে ত্রিপুরা।[৩]

বাংলাদেশের এ জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ভাষারই নিজস্ব লিখিত রূপের প্রচলন রয়েছে। নিজস্ব লিপি রয়েছে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, রাখাইন ইত্যাদি ভাষার। ককবরক (ত্রিপুরাদের ভাষা), বম, লুসাই, পাংখোয়া, গারোসহ কয়েকটি ভাষা রোমান লিপিতে লেখা হয়। বাংলা লিপিতে লেখা হয় সাদ্রি, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরীসহ কয়েকটি ভাষা। লিপি বিতর্কের মধ্যে রয়েছে সাঁওতালদের ভাষা। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা, রোমান ও অলচিকি লিপিতে সমান্তরালে লেখালেখির ব্যবস্থা প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এই ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে চাইলে এককভাবে বাংলা নাকি রোমান লিপিতে লেখা হবে, এ নিয়ে ঐকমত্যে পৌছাতে পারেননি সাঁওতাল নেতৃবৃন্দ। ফলে এই ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।[৪]

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো মূলত মৌখিক সাহিত্যের উপরই বেশি নির্ভরশীল। লোকগীতি, গীতিকবিতা, লোকজ ছড়া, ধাঁধা, নীতিকথা ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ভাষার বিকাশ ঘটেছে, রচিত হয়েছে সেসব ভাষাভাষী মানুষের কালের ইতিহাস। কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির চাপ ও আধুনিকতা নামের দ্রুত ধাবমান দানবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সকল জাতিসত্তার ভাষার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই নানা ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনেক ভাষা হারিয়ে ফেলতে থাকে তার নিজস্ব রূপ ও জৌলুস। অনুপ্রবেশ ঘটে অন্যান্য ভাষার অনুষঙ্গ। স্বাভাবিক বিকাশের ধারায় গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া না হওয়ায় অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষাই হারিয়ে ফেলে। দীক্ষা নেয় ভিন্ন ভাষাপরিবারের নতুন মন্ত্রে। ভোট-বর্মি ভাষাপরিবারের অনেক জাতিগোষ্ঠী এখন রীতিমতো ইন্দো-আর্য ভাষাপরিবারের প্রভাবশালী সদস্যে পরিণত হয়েছে। লিখিত চর্চার অনুপস্থিতি বা সীমিত সুযোগের কারণে অনেক ভাষার এই পরিণতি হয়ে থাকতে পারে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রকাশনা ও সাহিত্যকর্মই ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা ক্লাব-সমিতি কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা বের হয়। কিন্তু অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় এসব ভাষার ব্যবহার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষাগুলোর ব্যবহার বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলেও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কালের বিবর্তনে তা আজ ইতিহাসের অংশ। ১৮৬২ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে

---

[৩]প্রাগুক্ত ১-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৪]*The Daily Star*, 4 January 2017.

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম শুরু করার সময় চাকমা ও মারমা ভাষায় পাঠদানের একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ক্লাশগুলো 'চাকমা ভাষা ক্লাশ' ও 'মারমা ভাষা ক্লাশ' নামে পরিচিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনায় শুরু হওয়া চাকমা ভাষা ক্লাশটি কয়েকদিন পর বন্ধ হয়ে যায় এবং মারমা ভাষা ১৯১০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল বলে জানা যায়। ১৮৬৯ সালে চন্দ্রঘোনা হতে বর্তমান রাঙ্গামাটিতে জেলা সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করার ফলে চাকমা ভাষা ক্লাশ বন্ধ হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। ১৯৪০ সালে মোঃ মিল্লাত নামের জেলাপর্যায়ের জনৈক স্কুল পরিদর্শক 'চাকমা ভাষা শিক্ষা ক্লাশ' নাম দিয়ে একটি বিশেষ ভাষা ক্লাশ পুনরায় চালু করেন। এটিও কয়েক বছর চলার পর ঝিমিয়ে পড়ে। মিল্লাত সাহেব বাংলা বর্ণে 'চাকমা প্রাইমার'ও প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়, যেটি এখন দুষ্প্রাপ্য। সমসাময়িককালে জনৈক নূয়ারাম চাকমা নিজ উদ্যোগে চাকমা ভাষায় প্রাইমার বই প্রকাশ করেছিলেন, বইটির নাম ছিল *চাকমা ফথ্থম শিক্ষা*। সেই বইটি বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর জন্য সরকার অনুমতি দিলেও লেখক নূয়ারাম চাকমা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হওয়ায় বৃহত্তর চাকমা সমাজ বইটি গ্রহণ করেনি। তারপরও প্রকাশের পর বইটি কিছুদিন স্কুলে পড়ানো হয়। পরে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে এই উদ্যোগ থমকে যায়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হলে এই এলাকায় মাতৃভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত এই চুক্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করার বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়। এই চুক্তির পরবর্তী সময়ে গৃহীত বিভিন্ন আইনি দলিলগুলোতেও এই বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় শিক্ষানীতি ইত্যাদি সরকারি নীতি ও কৌশলপত্রেও এর ধারাবাহিকতা দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে 'Primary Education Situational Analysis, Strategies and Action Plan for Mainstreaming Tribal Children' নামের একটি বিশেষ পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা, শিক্ষকদের জন্যে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের ব্যবস্থা করা, তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবিকাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে নমনীয় স্কুল ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সন্নিবেশ করে সহপাঠক্রমিক শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন করা ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পিইডিপি-২'র পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতেও পূর্বের পরিকল্পনাগুলো ঠিক রেখে আরো কিছু নতুন পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়। ২০১০ সালে গৃহীত *জাতীয় শিক্ষানীতি*তে নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিকস্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রশস্ত করার লক্ষ্যে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা (য়) শিখতে পারে সেজন্যে

তাদের সমাজের শিক্ষক নিয়োগ ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রাথমিকস্তরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকল জাতিসত্তার জন্যে স্ব স্ব মাতৃভাষা (য়) শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা, এলাকার জীবন-জীবিকা ও মৌসুম অনুসারে নমনীয় স্কুলপঞ্জিকা নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এসব ইতিবাচক নানামুখি পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও মাঠের অবস্থা সার্বিকভাবে এখনও তেমন সন্তোষজনক নয়। ২০০০ সালে ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অনুসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব দেশের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে শতভাগ ভর্তির হার ও ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্যে লক্ষ্য স্থির করেছিল। সম্প্রতি ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত *দৈনিক কালের কণ্ঠ*-এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে গড় ভর্তির হার শতভাগের কাছাকাছি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে ঝরে পড়ার হার গড়ে এখনও ২০ শতাংশের উপরে রয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে এই হার আরও বেশি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিতে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করলেও ঝরে পড়ার হার কমাতে বাংলাদেশ তেমন সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এই তথ্য অনুসারে পার্বত্যাঞ্চলে ভর্তির হার মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার গড়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের গড় ঝরে পড়ার হার ২৫ শতাংশ, তার মধ্যে বান্দরবানে ২৯ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ২৩ শতাংশ ও রাঙ্গামাটিতে ২২ শতাংশ। ঝরে পড়ার এই উচ্চ হারের অন্য অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম হলো ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভাষাগত ব্যবধান, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকার অসামঞ্জস্য, মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক ও সহপাঠক্রমিক সামগ্রীর অভাব ইত্যাদি কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার চক্র সম্পন্ন করার আগেই ঝরে পড়ে।

শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত হয় শিশুদের পরিচিত ভাষা-পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয়ের যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়। মাতৃভাষা শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে তার জ্ঞান ও ধারণার সীমানাকে ক্রমশ সম্প্রসারিত করে। মাতৃভাষার উপর ভর করেই মানবশিশু ক্রমে অন্য ভাষা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সার্থক সংযোগ স্থাপন করে। এভাবেই নিজের জানা জগৎ থেকে শিশু ক্রমে অজানা জগতের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করে।

*জাতীয় শিক্ষানীতি*র অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১২ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ

করে। ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সচিবের সভাপতিত্বে প্রথমবারের মতো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভায় একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আহবায়ক করে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে একটি টেকনিক্যাল কমিটি, একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কমিটি এবং ভাষাভিত্তিক লেখক কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিকপর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদ্রি ও সাঁওতাল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্বিতীয়পর্যায়ে ম্রো, মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া), মণিপুরী (মৈতৈ), তঞ্চঙ্গ্যা, খাসি ও বম; তৃতীয়পর্যায়ে কোচ, কুড়ুখ (ওরাঁও), হাজং, রাখাইন, খুমি ও খ্যাং ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাষার মাধ্যমেও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম পর্যায়ের জন্যে নির্ধারিত ভাষাগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে শুরু করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। নানা যৌক্তিক কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। তবে ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জাতীয়ভাবে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে এমএলই ব্রিজিং প্লান প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। ২০১৫ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে কয়েক দফায় ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার লেখক-গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত লেখক প্যানেলের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সর্বশেষ লক্ষ্য স্থির করা হয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসকে। এ বছরও পরিকল্পনাটি নানা কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে এই বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বান্দরবান ও ঢাকায় প্রণীত উপকরণসমূহের চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রণীত খসড়া শিখন-শেখানো সামগ্রীর যৌক্তিক মূল্যায়ন ও সম্পাদনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে শুরু করে এ বছর (২০১৭) জানুয়ারি মাসে। জানুয়ারি ১ তারিখে পাঁচটি নির্ধারিত জাতিসত্তার শিশুদের হাতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যেই বই ছাপানোর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষার শিখন-শেখানো সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আশা করি, এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল শিশু তাদের মাতৃভাষায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তক হাতে পেলে বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসের একটি স্বর্ণালি অধ্যায় শুরু হবে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথরেখা অনুসরণ করে নানা প্রতিকূল পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৯ সালে বাংলার দামাল ছেলেদের সেই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* হিসেবে ঘোষণা করায় সারা বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের এই বিশেষ ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সারা পৃথিবীর বুকে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষী জনগণের জন্য এই ঘোষণা একটি বিশেষ দায়বদ্ধতা তৈরি করে দেয়। বাংলা ভাষাভাষীদের ভাষাপ্রীতি বিশ্বের অন্য সকল ভাষার মানুষের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। তাই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বসবাসকারী সবদিক থেকে প্রান্তিক ও সংখ্যায় কম জাতিসত্তাগুলোর নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ বা বিকাশের দাবিগুলোও আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। কোনো ভাষা সংরক্ষণ বা বিকাশের জন্য 'চর্চার' বিষয়টিই মুখ্য। চর্চা ছাড়া কোনো ভাষার বিকাশ ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব প্রান্তিক ভাষাগুলোর পুনরুদ্ধার, গবেষণা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ভাষার ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকেও এগিয়ে আসতে হবে নিরন্তরভাবে নিজ নিজ ভাষা চর্চায়। তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারিভাবে এসব প্রান্তিক ভাষা চর্চার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এসব ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা।

অদূর ভবিষ্যতে দেশের সকল ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হবে– এই কামনা করি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একুশের চেতনা

এম. শহিদুল ইসলাম*

উনিশশ বায়ান্নো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার ছাত্র-যুবসমাজ তাদের মাতৃভাষা বাংলার অধিকার সমুন্নত রাখতে গিয়ে যে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখেছিল বাঙালির জাতীয় জীবনে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তাদের সেই আত্মত্যাগের পথ ধরে জাতীয়তাবোধে শাণিত বাঙালি জাতি তাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতার পরেও একুশের চেতনা বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা প্রদান করে চলেছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে একুশের চেতনাকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। একুশের চেতনার আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা থেকে বলা যায়, বিশ্বের সকল মাতৃভাষাই তাদের স্ব-স্ব ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রিয় এবং এ সকল ভাষা যেহেতু সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবজাতির অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ, সেহেতু এ সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও উন্নয়নে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই চেতনার প্রায়োগিক দিক হচ্ছে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান প্রসারের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো এবং বহুভাষাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। যে প্রস্তাবের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কো ঘোষণা দেয় তাতে সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয়েছিলঃ "to encourage linguistic diversity and multi-lingual education for the development of fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue".

একুশের চেতনার আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা

ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে যেমন ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ইত্যাদি শক্তিশালী ভাষার

*ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং ইউনেস্কোর স্থায়ী প্রতিনিধি

প্রবল প্রভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক স্থানীয় ভাষা বিলীন হয়ে গিয়েছে, বিশ্বায়নের অভিঘাতে বর্তমানেও অনেক ভাষার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। বাঙালি জাতি তার মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় যে সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছে, বিশ্বের অনেক জাতি-ই তা করতে পারেনি। ইউনেস্কো যখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, তখন থেকে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় আমাদের তরুণদের আত্মত্যাগ বিশ্বের সকল জাতিকে মাতৃভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও চর্চার ব্যাপারে প্রেরণা যোগাতে শুরু করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের মহান ভাষা শহীদ দিবসের একটি নতুন আন্তর্জাতিক ডাইমেনশন সৃষ্টি হয়, যা আমাদের বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাৎক্ষণিকভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পরপরই ১৯৯৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, তিনি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গঠন করবেন, যা সারা বিশ্বের মাতৃভাষার উন্নয়ন ও গবেষণাসহ বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গঠনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ভূতপূর্ব মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ১৫ মার্চ ২০০১ তারিখে ঢাকার সেগুনবাগিচায় ১২-তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

যেহেতু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার উন্নয়নের জন্য কাজ করবে, সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কো-র সাথে সহযোগিতা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইউনেস্কো-র সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর ২০১৫ সালে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র লুপ্তপ্রায় ভাষা নয়, বরং চলমান জীবন্ত ভাষাসমূহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট এবং দৃশ্যমান অবদান রাখতে হবে এবং মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও কার্যক্রম চালাতে হবে। এসকল বিষয়ে ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

মাতৃভাষা চর্চা ও রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্রতিবছর এ দিনটিতে সেমিনারের আয়োজন করে। ইউনেস্কো-তে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্যের উপর বক্তব্য রাখার জন্য

প্রতিবছরই আমন্ত্রিত হন। সাধারণত তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগের কথা বিশ্বসম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিসত্তা নিয়ে বিবাদমান বিশ্বে একুশের চেতনার আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে একটি সহনশীল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া এই উপলক্ষে ইউনেস্কো-তে নিযুক্ত বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশের সাথে একযোগে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। গত বছর বাংলাদেশ মিশনের নেতৃত্বে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, লিথুনিয়া, গ্রিস, সৌদি আরব, তুরস্ক ও ভেনিজুয়েলার দূতাবাস ও তাদের শিল্পীগণ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে এবছর স্বল্প পরিসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইউনেস্কো-তে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি আয়োজনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও প্রভাব বজায় রাখতে হলে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর বিকল্প নেই। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের এদিনে ইউনেস্কো আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসী বাংলাদেশি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্মিলনে মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়মিত পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের করণীয়

একুশের চেতনাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। মনে রাখতে হবে, ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের বাইরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য বাংলা একাডেমি নিয়োজিত রয়েছে, কাজেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ হতে হবে ভিন্নতর- কীভাবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি করা যায়, কীভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করা যায়, কীভাবে ঢাকায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিদেশি গুণী ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করা যায়, কীভাবে ভাষা সংক্রান্ত সকল গবেষণা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানে বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়া যায়– এগুলোই হবে এ ইনস্টিটিউটের অগ্রাধিকার। এর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে দেশীয় পরিমণ্ডলের বাইরে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করতে হবে। মাতৃভাষার গবেষণা ও সংরক্ষণ, মাতৃভাষার চর্চা, মাতৃভাষায় পাঠ্যদানের মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসারসহ বিভিন্ন বিষয়ে এই ইনস্টিটিউট এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা তথা সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে

নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে। কোনো সদস্য রাষ্ট্র মাতৃভাষা বিষয়ক কোনো সাহায্য-সহযোগিতা চাইলে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আশার কথা যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বর্তমান কর্ণধার এসকল বিষয়ে সজাগ রয়েছেন এবং ধীরে ধীরে এই ইনস্টিটিউটটি তার পূর্ণ সামর্থ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সংস্কৃতি এবং ভাষার যথাযথ সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই মহাদেশের বেশির ভাগ বিবাদের মূলে রয়েছে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদানে অনীহা। অন্যদিকে, পশ্চিমা বিশ্বের দেশসমূহ অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে mono-culturalism এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ও স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতাই বিশ্বের সকল মানুষের সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ : বাচিক ও ভাষিক বৈশিষ্ট্য

মাহবুবুল হক*

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ (১৯৭১) বিশ্বের বাগ্মিতার ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে আছে। মনীষী ডিমিস্থিনিস, এডমন্ড বার্ক, উইনস্টন চার্চিল, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তেমনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি কেবল এ দেশের শহর-বন্দর ও গ্রামে-গ্রামান্তরে সভা-সমাবেশে ভাষণ দিয়ে জনচেতনার জাগরণে অসামান্য অবদান রাখেননি, সাতই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে পালাবদল ঘটিয়েছেন এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে। এই ভাষণ ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

সাতই মার্চের ভাষণ ছিল তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত বাঙালির প্রাণের কথা। তাতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল সর্বস্তরের বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষা।

যে পটভূমি ও পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা মনে রাখা দরকার। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের কায়েমি শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক চক্র বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক একনায়ক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও ১লা মার্চ আকস্মিক এক বেতার ঘোষণা দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তা মুলতুবি ঘোষণা করেন। এর পেছনে হীন উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা। এই চক্রান্ত বুঝতে পেরে অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলা। ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল পালিত হয়। ঐদিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে এই ভাষণ প্রদানের আগে আন্দোলনমুখর নাজুক পরিস্থিতির চাপে আশঙ্কাগ্রস্ত পাকিস্তানি সামরিক চক্র বঙ্গবন্ধুকে

*ভাষা-গবেষক ও প্রাবন্ধিক; উপাচার্য (চলতি দায়িত্ব), সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

এই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হলে ঢাকাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এই পটভূমিতে এক কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ও সমগ্র জাতির উদ্দেশে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ উপস্থাপন করেন।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাতই মার্চের ভাষণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। প্রথমত, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বক্তব্যের শুরুতেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে পরিস্থিতির সংকটের কথা জানিয়ে বাঙালি জাতির আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন মমতাময় জোরালো কণ্ঠে : ''আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।" সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যখন জাতীয় পরিষদে বসে শাসনতন্ত্র রচনা, দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্যে কাজ করার কথা সেখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক চক্র। এ যে নতুন নয় সেই দিকে ইঙ্গিত করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসন-শোষণের তেইশ বছরের করুণ ইতিহাসকে অভিহিত করেছেন, ''বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস।"

পাকিস্তানের জন্মের পর তেইশ বছর ধরে বাঙালির ওপর যে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন চলেছে, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করতে গিয়ে বাঙালিকে যে বার বার রক্ত দিতে হয়েছে সেই মর্মান্তিক ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে সহজ ভাষায় বঙ্গবন্ধু সবার সামনে উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন তুলে ধরেন :

> "কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে – তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু – আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধু এরপর নিজের ভূমিকা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন :

> "ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।"

জাতীয় পরিষদে যোগদানের শর্ত হিসেবে তিনি এরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেছেন। বলেছেন :

> "এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন –

> মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।"

দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিল প্রত্যয় সমুৎপাদক ভাষণ। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু এমনভাবে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশ করেছেন যে, শ্রোতাদের তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। রেসকোর্সের লাখো জনতাকে সামনে রেখে তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির সামনে এই প্রত্যয় সমুৎপাদন করেছিলেন যে, স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ ছাড়া জাতির অধিকার ও মুক্তি অর্জিত হবে না।

এই ভাষণের ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে তাঁদের ভবিষ্যৎ করণীয় ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব বাংলায় সার্বিক হরতাল অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তিনি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হরতালে শিথিলতা থাকবে তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নির্যাতন ও সামরিক হামলার বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিরোধ গড়ার দৃপ্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন : "আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় – তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু আশঙ্কা করেছিলেন তাঁকে হয়তো গ্রেফতার করা হতে পারে কিংবা মেরে ফেলা হতে পারে। এ কথা ভেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা রাস্তাঘাট সবকিছু বন্ধ করে দেবে।" পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে হুঁশিয়ারিমূলক আহ্বান জানিয়েছেন তাদের অস্ত্র সংযত করতে। বলেছেন, "তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।"

চতুর্থত, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অসাধারণ প্রণোদনা সঞ্চারী। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সংকটের মুহূর্তে জাতীয় করণীয় সম্পাদনে জনগণকে উজ্জীবিত করেছেন। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার বলিষ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মুক্তিপাগল বাঙালিকে শিহরণ-জাগানো আহ্বান জানিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে। ঠিক সেই মুহূর্তে আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি করেননি। এর যুক্তিসংগত কারণ এখন স্পষ্ট। কেননা তা হলে দেশদ্রোহিতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদিতার দায় চাপিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে অপরাধী বলে গণ্য করত। এদিক থেকে এই ভাষণের শব্দচয়নের মধ্যে দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশলগত দিক থেকে এই ভাষণ ছিল বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" – এই ঘোষণা করে পরোক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতার

সংগ্রামে জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন আত্মত্যাগের মহামন্ত্র : "রক্ত যখন দিয়েছি, আরও রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।" এই ঘোষণায় মুক্তিপাগল বাঙালি দুর্বার প্রাণশক্তিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই ভাষণের চেয়ে প্রণোদনামূলক ভাষণের উদাহরণ আর নেই।

বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের সম্বোধন অংশও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। তিনি ভাষণ শুরু করেছেন মাত্র দুটি শব্দ ব্যবহার করে : "ভায়েরা আমার"। এই সম্বোধনের মাধ্যমে মঞ্চে আসীন নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে রেসকোর্সের ময়দানে লাখো লাখো জনতার মনোযোগ দাবি করেছেন। 'ভায়েরা' শব্দটি ব্যবহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ দেশের সমস্ত গণমানুষকে কেবল সম্বোধন করেননি সেই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জণগণকে সম্বোধন করেছেন আত্মার আত্মীয় হিসেবে। তাঁদের মধ্যে কোনো শ্রেণিগত বা সামাজিক স্তর বিন্যাসগত ব্যবধান রাখেননি। সবাইকে সম মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। সেই সঙ্গে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করে নেতা হিসেবে সবার সঙ্গে এক আত্মিক সংযোগকে বাণীময় করে তুলেছেন।

ভাষণের সূচনায় বঙ্গবন্ধু সমাবেশের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতার যোগসূত্র ও প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরেছেন। পরিস্থিতি বর্ণনা ছাড়াও নিজের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের পূর্বাভাস দিয়ে উপস্থাপন করেছেন মূল বক্তব্য সম্পর্কিত ভূমিকা। এই ঐতিহাসিক ভাষণটি বাচনিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। আবেগময় বলিষ্ঠ অপূর্ব বাচনভঙ্গির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে নিজেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বক্তা এবং জাতির অপরিহার্য নেতা হিসেবে দর্শক-শ্রোতাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। ভাষণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিষয় অনুধাবনের জন্য শ্রোতাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত ও উন্মুখ করে তুলেছেন। প্রতিটি শব্দ যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় এমন ধারণা সৃষ্টি করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে মূল বক্তব্যের অভিমুখী করেছেন। এই ভাষণের প্রস্তাবনা অংশ পরিমিতির দিক থেকে যথেষ্ট সংহত এবং উপলক্ষ্যের সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণে সুনির্দিষ্ট ছকে এবং ক্রমপরম্পরায় মূল বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ধারাবাহিক, পারম্পর্যপূর্ণ এবং মূল প্রসঙ্গ-কেন্দ্রিক। তিনি সহজ সাধারণ ভাষায় বক্তব্যকে শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন। তাঁর প্রতিটি কথা শ্রোতাদের মনে দাগ কেটেছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। পুরো বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেছেন ভাবগাম্ভীর্য সহকারে, আবেগময় করে। তাঁর বক্তব্যে তিনি বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকাকে নস্যাৎ করেছেন এবং সমস্যার স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন।

বঙ্গবন্ধু বক্তব্যের সমাপ্তি টেনেছেন জাতীয় জীবনে পালাবদলের ঘোষণা দিয়ে। বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

সংগ্রাম।" এতে তাঁর বক্তব্যের সারবস্তু উঠে এসেছে। তাঁর পরিস্থিতি সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি, বাগ্মিতা পুরো ভাষণকে কাব্যিক মহিমামণ্ডিত করেছে। সেদিন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভাষণ শেষ করে বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল বাঙালিকে রণমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন।

উপলক্ষ্যের দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল নীতিনির্ধারণী ভাষণ। এ ভাষণে তিনি জাতির সামনে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয় উপস্থাপন করেছেন। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে দেশকে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরিহার্য পথে এগিয়ে নিতে হবে সেই তাৎপর্যকে তিনি সমুন্নত করেছেন এই ভাষণে।

এই ভাষণ ছিল তাৎক্ষণিক ভাষণ। বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নিজের চিন্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে উত্তাল লক্ষ জনতার সামনে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, চিন্তাশক্তি, বাচন ক্ষমতা ও উপস্থাপন কুশলতার উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিমিতি চেতনার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি সরাসরি স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করার দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, গণমুখী মনোভাব, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণকে তৈরি করার মহান উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কেবল শ্রোতাদের আস্থা অর্জন করেননি গোটা দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের কিছু ভাষা-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভাষণের শেষ দিকে মার্জিত পরিশীলিত প্রমিত চলিত ভাষার পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক উপভাষা তথা লোকভাষার ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে প্রমিত বাংলা ব্যবহার না করে আঞ্চলিক বা লোকভাষার প্রয়োগ করেছেন তিনি। যেমন :

ক) আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই... (প্রমিত – দিতে)
খ) আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি ... (প্রমিত – দিতে)
গ) সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। (প্রমিত – দাবিয়ে)
ঘ) যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। (প্রমিত – নিতে)

এই প্রয়োগকে নানা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায়। লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার এসব উদাহরণকে ব্যক্তিভাষার উদাহরণ হিসাবেও দেখা চলে। এর মধ্য দিয়ে একদিকে ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ভাষণে ব্যক্তিগত আবেগের আন্তরিক স্পর্শ লেগেছে।

লোকভাষায় মানী শ্রোতাপক্ষের বা সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ (আপনি, আপনারা ইত্যাদি) ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। সাতই মার্চের ভাষণে লোকভাষার এই বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রয়োগ

লক্ষ করা যায়। তিনি বক্তৃতার শুরুতে দর্শক শ্রোতাদের সম্বোধন করার সময়ে সম্মানসূচক সম্বোধন করেছেন: ("দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।") কিন্তু ভাষণের শেষ দিকে তাঁর ভাষণে লোকভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। তিনি ব্যবহার করেছেন সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপ । যেমন :

১. "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"
২. "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে শাসকগোষ্ঠী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সম্ভ্রমাত্মক ভাষা ব্যবহার করলেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে লোকভাষার এই ধরনের প্রয়োগ সাধারণ জনগণের সংহতির বন্ধনকে বহুলাংশে প্রতিফলিত করে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বুলিমিশ্রণের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। তিনি অবলীলায় তাঁর ভাষণে বহু ইংরেজি শব্দের মেশাল দিয়েছেন। যেমন : মেজরিটি পার্টি, এসেম্বলি, রাউন্ড টেবল কনফারেন্স, মার্শাল ল, উইথড্র ইত্যাদি। এ ধরনের বুলিমিশ্রণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক সমাজে বেশি লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে দেখলে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ভাষার দিক থেকে আধুনিক নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে লোকায়ত সমাজের সকল স্তরের জনগণের ভাষার প্রতিনিধিত্বকারী। ফলে এই ঐতিহাসিক ভাষণটি কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয় ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যচেতনার উৎসারে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সামষ্টিকবোধ বিস্তরণে প্রণোদনামূলক ভূমিকা রেখেছে।

সাতই মার্চের ভাষণে ব্যবহৃত শব্দসম্ভার এমন যে তা সঙ্গে সঙ্গে সহজেই শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। সেগুলো ভাবগাম্ভীর্যময় আবেগ প্রকাশের উপযোগী। ভাষণে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ, মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গি, ব্যক্তিত্বময় ভাবগাম্ভীর্য ও নাটকীয় উপস্থাপনা ভাষাকে করে তুলেছে হৃদয়গ্রাহী, প্রণোদনামূলক ও আবেদন সঞ্চারী। ভাষণটি ছিল একদিকে শ্রুতিমধুর একই সঙ্গে তা ছিল কঠোর নির্দেশনা-ঋদ্ধ। কোমলের সঙ্গে কঠোরের আশ্চর্য মেলবন্ধনের উদাহরণ এই ঐতিহাসিক ভাষণটি। এই ভাষণের অনেক বাক্য ও বাক্যাংশ ছিল গূঢ়ার্থক, ব্যঞ্জনাময় ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন তিনি ভাষণের এক জায়গায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসী ভূমিকা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।" এ কথার ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সামরিক হামলা আশঙ্কা করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সাতই মার্চের ভাষণের শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, সতর্ক ও সাহসী বক্তব্য প্রদান ইত্যাদি ছিল একটি অসাধারণ সৃষ্টি। তা দেশব্রতী বাঙালি জাতিকে রূপান্তরিত করেছিল বীরব্রতী জাতিতে। ঐতিহাসিক এ ভাষণ সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কায়েমি শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। নস্যাৎ করে দিয়েছিল তাদের হীন ষড়যন্ত্রকে। বাংলাদেশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। এই ভাষণের মহান প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রক্ত, অশ্রু ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা

কাবেদুল ইসলাম*

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে[১] ও স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে[২] প্রদত্ত ভাষণ বহুবিশ্রুত, সুবিদিত ও বিপুল জনগণনন্দিত।

ঐতিহাসিক এ ভাষণটি নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এ ভাষণের যেমন রয়েছে অপরিসীম রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অন্যবিধ বহুমাত্রিক মাহাত্ম্য, তেমনি এর ভাষা-ব্যাকরণগত দিকগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। বিশেষ করে যদি মনে রাখা হয় যে, বাঙালির অবিসংবাদিত মহানায়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিষিক্ত কোনো ভাষাবিদ বা ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না। রাজনীতিই ছিল তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য-অর্জনের একমাত্র আয়ুধ এবং স্বজাতি-স্বভাষী বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিচিন্তা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাহলে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে প্রতীয়মান হবে, তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ভাষণ ও কথাকাব্যে ভাষাশিল্পের এক অসাধারণ জাদু স্ফুরিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা বলে নেয়া দরকার।

প্রথমত, এ ভাষণের স্থায়িত্বকাল ছিল মোটামুটি ১৮ মিনিটের মতো। কেউ কেউ এর কিছু বেশিও বলেছেন, তবে প্রাপ্ত অধিকাংশ মতই ১৮ মিনিটের পক্ষে।[৩] অন্যভাবে বললে, এর প্রথম জোড়-শব্দ বা পরম আত্মীয়তাজ্ঞাপক সম্বোধন 'ভায়েরা (ভাইয়েরা) আমার' থেকে শুরু করে তাঁর আগাগোড়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অকম্পিত স্বরে উচ্চারিত এবং শেষত বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত বিজয়-সূচক 'জয় বাংলা', যেটি অতঃপর বাঙালির অবিনশ্বর চৈতন্যে ও প্রাতিস্বিক কথনে-সঞ্চালনে বিশেষ করে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধপর্বে প্রায় সকল বাঙালি-জনমানসের অনপনেয় শক্তি ও দুর্মর উজ্জীবনের স্মারক হয়ে উঠেছিল– সেই শব্দযুগ উচ্চারণ পর্যন্ত বক্তা-বঙ্গবন্ধু সময় নিয়েছিলেন মাত্র ১৮ মিনিট। তবে সেদিন যে অভূতপূর্ব মুক্তিবার্তা শ্রবণের অধীর আগ্রহে দলে দলে মানুষ রৌদ্রতপ্ত ময়দানে হাজির হয়েছিল, তাদের উদ্দেশে যদি তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টাও অবিরাম বলে যেতেন, মনে হয় না তাতে সমবেত

*সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। কবি, ছোটগল্পকার ও গবেষক

উন্মুখ জনতা এতটুকু বিরক্ত বা ধৈর্যহারা হতো। এর অন্যতম কারণ বঙ্গবন্ধুর চিরপরিচিত, জলদগম্ভীর, তীব্র সম্মোহক ও অন্তর্ভেদী কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি তথা এককথায় অননুকরণীয় ভাষণশৈলী, যা এ অঞ্চলের মানুষের কর্ণকুহরে, অভিজ্ঞতায় আগে আর কেউ সেভাবে অনুপ্রবিষ্ট করাতে পারেনি; ফলে তা শুনতে অগণিত মানুষ সব সময়ই হাজির হতো। আর সেদিন তো তাঁর কাছে ছিল তাদের অন্য রকমের চাওয়া, প্রত্যাশা। তাই যখন মিতকথন অধিক বক্তব্য ও গূঢ় ইঙ্গিত সঞ্চারী হয়, তখন আদতে ঘণ্টা-প্রহর নয়, বরং অঙ্কের হিসাবে দৃশ্যত ১৮ মিনিটই হয়ে ওঠে অমোঘ ও অনিঃশেষ। ৭ই মার্চের ভাষণ সেটাই প্রমাণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, এ ভাষণে 'কার' যুক্ত (যেমন 'া'=আ-কার যুক্ত 'না', 'ে'=এ-কার যুক্ত 'যে', 'সে', 'ী'=দীর্ঘই কার যুক্ত 'কী' বা অনুরূপ) একাক্ষরিক শব্দ বা পদ, মৌলিক ও সাধিত শব্দ [যেমন ঐ, ল' (Law), তিনি, যদি, মুক্তি, আমাদের, মুসলমান, সাংস্কৃতিক (সংস্কৃতি+ষ্ণিক/ইক), সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদি], সমাসবদ্ধ পদ ও যুগল শব্দ (যেমন রাজপথ, জজকোর্ট, প্রতিবাদমুখর, লুটতরাজ ইত্যাদি) বা ক্রিয়া-বিশেষণ (যেমন শান্তিপূর্ণভাবে, সম্পূর্ণভাবে ইত্যাদি) প্রভৃতি মিলিয়ে (আমাদের কৃত শব্দবিন্যাস ও গণনা মতে) ১,১০৫ টির মতো শব্দ (অঙ্কবাচক বা Numerals, তারিখবাচক বা Dates, পূরণবাচক বা Ordinals ও গণনাবাচক বা Cardinals-সহ) রয়েছে। এর মধ্যে শব্দ ১,০৮৮টি এবং সংখ্যা ও সংখ্যাশব্দ ১৭টি। এ সংখ্যা সামান্য কম-বেশি হওয়া বিচিত্র নয় যদি সমাসবদ্ধ পদ, যুগল শব্দ ও নামপদগুলোকে দুশব্দে বিন্যস্ত করে দেখানো হয়। যেমন, 'লুটতরাজ'-কে 'লুট' ও 'তরাজ', 'মাইনাপত্র'-কে 'মাইনা' ও 'পত্র', 'পূর্ববাংলা'-কে 'পূর্ব' ও 'বাংলা' ইত্যাদি। একইভাবে 'এমনকি'-কে 'এমন' ও 'কি', 'তারপরে'-কে 'তার' ও 'পরে' ইত্যাদি।

যাই হোক, এর মধ্যে প্রচলিত মতে বাংলা ভাষার সকল শ্রেণির– চার (তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি) বা পাঁচ (তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি) অথবা বড়ো জোর ছয় (*বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) শ্রেণির শব্দই লভ্য। অধিকন্তু রয়েছে সাধু ও চলিতের চমৎকার রসায়ন, কথ্য বা আঞ্চলিক তথা লোকভাষা বা উপভাষা, এমনকি পুরোপুরি কাব্যিক পদও; শেষোক্ত প্রয়োগের ব্যাপারে আগেই বলে রাখা দরকার, 'তরে'– এ কাব্যিক পদটির প্রয়োগ অত্যন্ত দুঃসাহসী, অব্যর্থ ও এখন পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিদেশি শব্দসম্পদের মধ্যে আরবি-ফারসি, হিন্দুস্থানি (হিন্দি-উর্দু), গুজরাটি (১টি), জাপানি (১টি), পর্তুগিজ (১টি) ও ইংরেজিই প্রধান। এর মধ্যে আরবি-ফারসি ৪৮টি এবং ইংরেজি ৪২টি। এতে দুটি Acronym রয়েছে, যথা RTC ও WAPDA।

তৃতীয়ত, এ ভাষণের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় এবং বক্তা-বঙ্গবন্ধুর জন্য যুগপৎ ঈর্ষণীয় ও শ্লাঘনীয় হলো এই যে, এটি বাংলার সর্বকালের ইতিহাসে প্রথম অলিখিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ (Best) ভাষণ, অন্যকথায় বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণে এর সমতুল্য ভাষণের দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনো প্রকার লিখিত Script বা সংক্ষিপ্ত Notes-Points-এর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত, বরং শুধু বক্তার একক মস্তিষ্ক-সঞ্চিত চিন্তাসূত্র অবলম্বী মুখ-নিঃসৃত কথামালা হিসেবে প্রকাশ্য জনসভায় এটি উপস্থাপিত। প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ তনয়া শেখ হাসিনা (একাধিকবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী) বর্ণিত একটি মূল্যবান বক্তব্য এখানে উৎকলন করা হলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, এজন্য বঙ্গবন্ধুর মস্তিষ্কে একটা গভীর ভাবনার আলোড়ন অবশ্যই তৈরি হয়েছিল, যার দুর্ভার তিনি মুক্ত হয়েছিলেন সেদিন বিকেলে রেসকোর্সে– 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'– এই মহাকাব্যিক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। জানা যাক, সেটি। শেখ হাসিনা তাঁর *ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ : কিছু স্মৃতি* শীর্ষক রচনায় জানাচ্ছেন (নাতিদীর্ঘ হলেও এখানে তুলে ধরছি):

'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা।.. ওই দিন কত মানুষ, কত মত, কত কাগজ, কত পরামর্শ। আব্বা সবই ধৈর্যসহকারে শুনেছেন। সব কাগজই গ্রহণ করেছেন। সারাটা দিন এভাবেই কেটেছে। যখন জনসভায় যাওয়ার সময় হলো তার কিছুক্ষণ পূর্বে আব্বা কাপড় পরে তৈরি হবেন। মা আব্বাকে ঘরে নিয়ে এলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আব্বাকে বললেন, ১৫ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্য। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথাটা টিপে দিচ্ছিলাম। মা বেতের মোড়াটা টেনে আব্বার কাছে বসলেন। হাতে পানদান, ধীরে ধীরে পান বানাচ্ছেন আর কথা বলছেন। যে কোনো বড় সভায় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে মা আব্বাকে কিছুক্ষণ একদম নিরিবিলি রাখতেন। সেদিন আব্বার একটু সর্দি ছিল। আমি গলায় কপালে ভিক্স মালিশ করে দিলাম। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকলেন।/ আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার ওপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত, তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, ভরসা করে।'[৪]

তাছাড়া বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তা-বঙ্গবন্ধুর সেদিনের গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ দেহভঙ্গি (Gesture) লক্ষ করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কী অচঞ্চল ভাব ও স্থিতধী প্রজ্ঞায় আসমুদ্র হিমাচল মন্দ্রিত এ ভাষণটি স্বয়ম্ভূ-রূপে রচনা করেছিলেন তিনি (স্মর্তব্য, পূর্বোক্ত 'তোমার মনে যে কথা আছে তুমি তাই বলবে।') প্রখর প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর একজন আত্মপ্রত্যয়ী নেতার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার স্মারক তাই এটি।

এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজ কবি William Wordsworth-এর কথায় 'কবিতা' (Poetry)-কে যদি বলা হয়– '...the spontaneous overflow of powerful feelings', তাহলে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্তত বাগ্মীর সেদিনের মানসযাত্রার স্বতোচ্চারিত অভিক্ষেপ

বিচারে এটি বাহ্য-চারিত্র্যে আপাতদৃষ্টিতে একটি ‘ভাষণ’ (Speech/ Address) মাত্র হলেও, গূঢ় আন্তরচারিতায়– সুচিন্তিত ভাবনার ও বক্তব্যের সারাৎসারে তথা এককথায় সুষম শব্দের বিন্যাসে (‘best words in best order’—Samuel Taylor Coleridge) ভাষণটির কোনো কোনো পদসজ্জা, বাক্য বা বাক্যসারি একেকটি ‘গদ্যকবিতা’র অংশ হয়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

চতুর্থত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য ভাষণ বা বক্তৃতা দিয়েছেন। এর কোনোটি মৌখিক ও লিখিত– সংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ ও দীর্ঘপরিসর। এগুলোর মধ্যে স্বদেশে প্রদত্ত ভাষণই বেশি, তবে বিদেশের মাটিতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষণ রয়েছে। যেমন, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ, তারও আগে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যখন লন্ডন হয়ে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন হিথরো বিমান বন্দরের লাউঞ্জে বিদেশি সাংবাদিক সমাবেশে সগর্বে উচ্চারিত কথামালা অন্যতম। তবে সব মিলিয়ে ৭ই মার্চের আলোচ্য ভাষণই আবহমান বাঙালি জাতির সর্বকালের এ শ্রেষ্ঠসন্তানের জ্ঞান, মনীষা, প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভূতপূর্ব দলিলই শুধু নয়, উপরন্তু সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এ জাতীয় সুবিদিত যে কয়েকটি দুর্লভ ভাষণের নিদর্শন মেলে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে অলিখিত বা স্বতঃস্ফূর্ত কথামালায় সজ্জিত এবং একটি স্বাধীনতাকামী জাতির মুক্তির দিশাসঞ্চারী হিসেবে এটি একক ও অনন্য।

পঞ্চমত, ভাষণে বঙ্গবন্ধু মোট ৭টি স্থাননাম, যথা– করাচি, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পেশোয়ার, রংপুর ও রাজশাহী এবং ৪টি দেশনাম, যথা– পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ববাংলা, বাংলা ও বাংলাদেশ ব্যবহার করেছেন। দেশনামগুলোর মধ্যে বাংলা ও পূর্ববাংলা একাধিকবার এবং ‘বাংলাদেশ’ নাম মাত্র ১-বার ব্যবহার করলেও শেষোক্ত দেশনামটি (‘বাংলাদেশ’) উচ্চারণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আলোচ্য ভাষণের আগে ‘বাংলাদেশ’ নাম কারও কারও রচনায় লভ্য এবং এদেশীয় বাঙালির বক্তৃতায়-বিবৃতিতে কালে-ভদ্রে শ্রুত হলেও এবং বিশেষ করে ইতিহাসবিদগণ ‘বাংলা’ ও ‘বাংলাদেশ’ দ্বারা ‘পূর্ব’ ও ‘পশ্চিম’– উভয় বাংলাকে একত্রে নির্দেশ করলেও [যে-কারণে ১৯৭১ সালে ‘বাংলাদেশ’ রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ (তাঁর ৪-খণ্ডের ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’ দ্রষ্টব্য) ভারতীয় ঐতিহাসিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবিগণ (ভারত সরকারের বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত ২-খণ্ডের *Bangla Desh Documents*, যতীন্দ্র ভাটনগর লিখিত *Bangla Desh—Birth of A Nation* (1971) প্রভৃতি গ্রন্থনাম লক্ষণীয়) একে ‘বাংলা দেশ’ রূপে অর্থাৎ অনাবশ্যকভাবে দুশব্দে বিভক্ত করে লিখেছেন] অবিভক্ত বঙ্গের পূর্বাংশ নিয়ে স্বতন্ত্র দেশ-প্রত্যয়বাচক হিসেবে এ ভাষণে ‘বাংলাদেশ’ ব্যবহার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে তথা বাঙালি জাতির স্বার্থ বিবেচনায় অত্যন্ত ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। কারণ তা ছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির ইঙ্গিতবাহী। অন্যদিকে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, ভাষণে বঙ্গবন্ধু ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ ও ‘পাকিস্তান’ একাধিকবার

উচ্চারণ করলেও একটিবারের জন্যও 'পূর্বপাকিস্তান' শব্দবন্ধ উচ্চারণ করেননি। অখণ্ড পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে 'পূর্ববাংলা' ও 'বাংলা' দেশনাম তখন অবলুপ্ত আর 'বাংলাদেশ' নামের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রবল জেল-জুলুমের ঝুঁকি নিয়ে হলেও (দুরাচারী শাসককুল এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অজুহাতে মামলা করতে পারত) বিদ্যমান সংবিধানের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন।

ষষ্ঠত, বক্তা-বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব শৈলীর অননুশীলনীয় বাক্-ভঙ্গিমার (Style) যুগপৎ নমুনা ও প্রাচুর্য যেমন এতে বর্তমান, তেমনি পূর্ববঙ্গের মানুষের সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রামের সালওয়ারি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তিনি বলেছেন, '১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে ১০ বচ্ছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন..।' লক্ষণীয়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১– এই চব্বিশ বছরে বাঙালির সালচিহ্নিত যে আন্দোলন-সংগ্রামের বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাসগাথা রয়েছে, তার শুধু একটি সাল-ই এ ভাষণে অনুপস্থিত এবং তাও সঙ্গত কারণে। কেননা ১৯৭১-এর স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর দলের নিরঙ্কুশ বিজয়, সেটিও ধারাবাহিকতায় প্রোক্ত ধারাপ্রবাহের সামান্য পরেই রয়েছে। "তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো।"

বস্তুত একজন অনলবর্ষী রাজনীতিবিদের মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি কতখানি প্রখর হলে তবেই না তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় তা নির্ভুল ধারাক্রমে উচ্চারিত হতে পারে, এটা ভাবলেও বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। আবার এর চেয়েও বড়ো কথা, যুগ যুগ ধরে বিদেশি শাসনে নিষ্পিষ্ট, শোষিত, অধিকারবঞ্চিত– বলা যায় নিজভূমে পরবাসী 'বাঙালি' জনগোষ্ঠী যখন ইতিহাসে প্রথমবারের ন্যায় একজন যুগন্ধর নেতার যোগ্য ও সুচারু পরিচালনায় সম্মিলিত, যূথবদ্ধ, তখন ইতিহাসের সেই মহাক্রান্তিকালে স্বাধীনতাকামী, কর্তব্য-অন্বেষু বাঙালি জাতিকে উপযুক্ত পথ-নির্দেশনার ভাষিক ইঙ্গিত বা আলোক-দ্যুতিও ভাষণটিতে প্রতিসরিত হয়েছে।

আসলে ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল কৌশলগত স্বাধীনতার ঘোষণা– 'আলটিমেটাম' (Ultimatum)। অখণ্ড পাকিস্তানের মধ্যে থেকে স্বাধীনতাসম্পর্কিত এর চেয়ে সরাসরি, সোচ্চার বক্তব্য উচ্চারণ বোধগম্য কারণেই সেদিন সম্ভব ছিল না বলে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। দুঃশীল সামরিক শাসনের নিগড়ে, নিশ্ছিদ্র কঠোর নজরদারির মধ্যে থেকে (শেখ হাসিনার স্মৃতিচারিতা স্মর্তব্য– 'তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, সামনে তোমার লাঠি, পেছনে বন্দুক।' এ বন্দুক সামরিক শাসকের) বঙ্গবন্ধু যে সুচয়িত শব্দসম্পাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা সত্যিই তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও চমৎকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক।

প্রসঙ্গত হারুন-অর-রশিদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ছেষট্টি থেকে একাত্তর' নামক প্রবন্ধে হারুন লিখেছেন: "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল একজন দক্ষ কৌসুলির (*কৌসুলির*) সুনিপুণ বক্তব্য উপস্থাপন। দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে যাতে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত না হন, এ-ব্যাপারে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। তাহলে, স্নায়ুযুদ্ধ চলমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাঁর সম্মুখে দৃষ্টান্ত ছিল কীভাবে নাইজেরিয়ার বেয়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭০) বৃহৎ শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কঠোর হস্তে দমন করা হয়। তাই তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। বিশেষত ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি 'স্বাধীনতার' কথা এমনভাবে উচ্চারণ করেন, যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকলো না, আবার তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার (Unilateral Declaration of Independence-UDI) অভিযোগ উত্থাপন করাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য সহজ ছিল না।.. / বঙ্গবন্ধুর এ-ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। এরূপ ঘোষণাদানের ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব যা-কিছু তা একমাত্র তাঁরই ছিল।"[৫]

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। প্রসঙ্গত নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত (২০১৪) সলিল ত্রিপাঠীর *The Colonel Who Would Not Repent: The Bangladesh War and Its Unquiet Legacy* গ্রন্থে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে যে ভূয়োদর্শন তৈরি করেছেন, একটু দীর্ঘ হলেও, তার মৌল প্রতিপাদ্য গ্রন্থকারের কথায় নীচে উদ্ধার করা হলো[৬]:

"Mujib was probably wise in not declaring independence. Before reaching the Race Course on 7 March, Mujib had met the United States ambassador that morning, and he was told that if he declared independence, the US would not back him. The Chinese too did not support any separist idea. Anisuzzaman told me: 'He knew that the time was not right. He had to weigh many factors. His people wanted him to declare independence. He wanted to go as close as he could to that sentiment without using the word "independence". And that's why in his speech he spoke of mukti which can mean liberation, and shadhinota (*swadhinata*) which means freedom./ Sultana Kamal was also at the Race Course and heard Mujib speak. She recalled: 'We don't know the extent to which he was contemplating declaring freedom. People had chosen him as their leader. Was he keen to take the final step, or was he being pushed by the people? Looking back, he was wise in not declaring independence in the Race Course meeting. Otherwise we would have all been called secessionists, and we would have lost a lot of support, particularly internationally. The integrity of the country and his movement would have been the issue. We didn't know what

others would say; we didn't know what India would do. So he did not declare independence.'/ The dilemma that Mujib had was a simple one—what would happen after he declared independence? He had won a sensational electoral victory, but would all the people support him in a move to create a new country? He commanded no troops, and administering and managing a country the size of Bangladesh would have been a complex task. And what if Pakistan rejected the demand flat out, as it had with his demands for more autonomy?/ Those who have known Mujib believe he wanted Pakistan to make the first offensive move."

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ও দৃপ্ত ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন ২৫-২৬শে মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে[৭], তবে ৭ই মার্চের এ ঘোষণা ছিল সেই ঘোষণারই পূর্বসূত্র বা নামান্তর। অবস্থা বৈগুণ্যে এতে এক ধরনের ভাষিক চাতুর্যের আশ্রয় বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু যে জনতার উদ্দেশে তাঁর এ দিক-নির্দেশনা মেঘমন্দ্রিত হয়েছিল, তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য– বার্তা (Message) তারা ঠিকই অনুধাবন করেছিল।

কার্যত তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি। বঙ্গবন্ধুর অচঞ্চল কণ্ঠের সুস্পষ্ট ঘোষণা– '.. তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।.. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'– এর মর্মবাণী সেদিন শুধু সাধারণ বাঙালি নয়, বরং সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সৈন্যরাও সেদিন তা বুঝে নিয়েছিল। এমনই ছিল ৭ই মার্চের ভাষণের সর্বব্যাপক প্রভাব। প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের 'জেড. ফোর্স'-প্রধান মেজর (পরে কর্নেল) জিয়াউর রহমানের ১৯৭৪ সালে (এ সময় তিনি ছিলেন 'মেজর জেনারেল') অধুনালুপ্ত '*সাপ্তাহিক বিচিত্রা*'য় প্রকাশিত (পুনর্মুদ্রিত) *একটি জাতির জন্ম* শীর্ষক রচনা থেকে জানা যায়, ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা ছিল স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক পূর্বপ্রস্তুতির 'গ্রিন সিগন্যাল'ই বটে। তিনি লিখেছেন (প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত): "তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।.. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো।"[৮]

সপ্তমত, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র প্রকাশ্যে ও অন্তরালে নানা ষড়যন্ত্র ও টালবাহানা শুরু করেছিল। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নাটের গুরু ও কূটচালদাতা ছিলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো। ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ছিল তার হাতের পুতুল বা ক্রীড়নক মাত্র। বঙ্গবন্ধু এসব সম্যক জানা সত্ত্বেও কখনও প্রকাশ্য কথাবার্তায়, ভাষণে-বক্তৃতায় তাদের প্রতি অসৌজন্যমূলক বাক্য উচ্চারণ করেননি বা

অরাজনীতিকসুলভ আচরণ করেননি। অথচ এদেশের সমস্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ সময় তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্বে ২৪ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি গোলামি মুক্তি তথা স্বাধীনতার এক দফা দাবিতে একাট্টা হয়েছিল। রাজধানী ঢাকাসহ গোটা পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তান তখন তাঁর *de facto* নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র একটা ছিল বটে, তবে তা ছিল প্রায় অকার্যকর। আপামর বাঙালি তখন তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িকে কেন্দ্র করে দিবা-রাত্র তাঁর আদেশ-নির্দেশে আবর্তিত। বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি তখন পূর্বপাকিস্তানের সকল ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৎকালে ঢাকায় চাকুরি ও অবস্থান-রত খোদ পাকিস্তানি জেনারেলরা পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করেছেন। যেমন, উনিশশ' একাত্তরে বাঙালি নরহত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম ও বাস্তবায়নকারীদের দ্বিতীয়-প্রধান মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান তার *How Pakistan Got Divided* (*বাংলাদেশের জন্ম* নামে অনূদিত) গ্রন্থে লিখেছেন, "অসামরিক প্রশাসনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার এবং এর সংস্কার করার জন্য আমার প্রচুর করণীয় কাজ ছিল। সর্বত্র তখন বিভ্রান্তি চলছিল। বাস্তবে কোনো সরকারের তখন অস্তিত্ব ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার আওয়ামী লীগের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল।"[৯]

লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি তার *The Betrayal of East Pakistan* গ্রন্থে লিখেছেন, "Mujib declared: 'Pakistan as it stands is finished. There is no longer any hope of a settlement. I will break them and bring them to their knees." It was clear that Bangladesh had come into existence. Mujib had become the *de facto* ruler and his home had turned into the Presidency. Orders from the Central Government were defied."[১০]

উপরে পাকিস্তানি জেনারেলদের এ কথাগুলো এখানে এ জন্যই তুলে ধরা হলো যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছিল, ক্ষমতা আর তাদের হাতে নেই, নিয়ন্ত্রণে তো নয়ই। বঙ্গবন্ধু তখন তথাকথিত অখণ্ড পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের তথা পূর্বপাকিস্তানের একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও নিয়ন্তা। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সাড়ে সাত কোটির মানুষের অদম্য শক্তি ও আস্থার প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কখনও সামান্য মাত্রও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বা আত্মম্ভরী ভাব প্রদর্শন করেননি– না ভাষায়-কথনে, না কাজে-আচরণে। এর সম্যক প্রমাণ মেলে আলোচ্য ভাষণে।

১৮-মিনিটের ভাষণে ক্ষমতাসীনদের প্রতি তিনি সামান্যতম উষ্মা, বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক উক্তি প্রকাশ করেননি। বরং যে কয়েকবার তাদের নামোচ্চারণ করেছেন, প্রত্যেকবারই তিনি সম্বোধনে ভদ্রতা ও শালীনতার বিরল নজির দেখিয়েছেন। যেমন, ভুট্টো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হয় 'জনাব ভুট্টো' বা 'ভুট্টো সাহেব', তেমনি ইয়াহিয়া খানের ক্ষেত্রে 'এহিয়া/ ইয়াহিয়া খান সাহেব' বা 'জেনারেল এহিয়া/ ইয়াহিয়া খান সাহেব' এবং আয়ুব খানের

প্রসঙ্গে 'আয়ুব/ আইয়ুব খান' বলেছেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নামোচ্চারণ করেছেন। এক্ষেত্রে শুধু 'ভুট্টো' বা শুধু 'এহিয়া/ ইয়াহিয়া খান' বা 'আয়ুব/ আইয়ুব খান' বললেও তেমন ক্ষতি ছিল না, বরং সেই প্রবল 'Tense' অবস্থায় মোটেও তা অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু জাতীয় জীবনের সেই মহাসঙ্কটজনক মুহূর্তেও যথার্থ উদারচিত্ত ও আদর্শবান বিশ্বনেতার ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদ ধুরন্ধর 'ভুট্টো' ও স্বৈরশাসক নিপীড়ক ইয়াহিয়ার প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। একেই বলে রাজনৈতিক শিষ্টাচার। এ ভাষণ তার মূর্ত দলিল।

অষ্টমত, বঙ্গবন্ধু 'মানুষের অধিকার' ফিরিয়ে দিতে হরতাল বা 'বন্‌ধ' ডেকেছেন। কিন্তু সেখানেও বুদ্ধির কী অপূর্ব দীপ্তি ও মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে, তা ভাবলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত না হয়ে পারে না। বস্তুত যাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তিনি এ হরতাল ডেকেছেন, তারা অর্থাৎ দৈনন্দিন খেটে-খাওয়া মানুষ সরাসরি জড়িত যেসব বস্তুনিচয়ে, অন্যকথায় সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকা যাতে কোনোক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে যেমন কঠোর, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, তেমনি যাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম, তাদেরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলো হরতাল– কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।"

বলাবাহুল্য, যে কোনো হরতালে-'বন্‌ধে' প্রথম ধাক্কায় যারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, কী অসাধারণ নৈপুণ্যে তাদেরকে তিনি তা থেকে রেহাই আর নিশ্চিত বরাভয় দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটিও এ ভাষণের একটি শিক্ষণীয় দিক।

যাই হোক, এগুলো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণের একটা দিক।

এখন আমরা ভাষণের ভাষাতাত্ত্বিক কিছু বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করব। আগেই বলে রাখি, আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বাইরেও ভাষাগত অনালোচিত দিক থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আশা করব, যোগ্য জহুরীর হাতে পড়ে সময়ে তা আরও সমৃদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হবে।

এক. বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত পদবিন্যাস মতে অর্থাৎ ৫-প্রকার পদের অন্যতম সর্বনাম পদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু মোট ২৫টি সর্বনাম এ ভাষণে ব্যবহার করেছেন ('এ' ও 'এই'– এ দুটো পদকে সর্বনামরূপে গণ্য করে; যদিও এ দুটোকে অন্য পদসোপানেও নেয়া চলে)। এগুলোর মধ্যে প্রধান তথা সর্বাধিক উচ্চারিত হয়েছে 'আমার' ও 'আমরা' (সমান ২০ বার; অতঃপর শুধু সংখ্যা উল্লিখিত) এবং 'আমি' (১৮)। একজন দেশপ্রেমিক নেতা কতখানি জনগণ-অন্তপ্রাণ হলে তাঁর বোধে ও বোধিতে 'আমি' ও 'আমরা' একাত্ম হয়ে

যায়, তা এ থেকে অনুমান করা যায়। অধিকন্তু এটাও লক্ষণীয়, সারা পৃথিবীব্যাপী সর্বকালেই এটা একটা প্রথাসিদ্ধ ভাষণশৈলীর Figurative অংশ যে, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান (যেমন, অতীতে রাজা ও রানি), জনগণের উপর অত্যন্ত প্রভাবশালী, ওজস্বী নেতৃবর্গ যখন স্বভাষী-স্বজাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন, কথা বলেন বা কোনো সম্প্রচারে অংশ নেন, তখন তাঁরা 'আমি' ও 'আমরা' দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে ব্যবহার করে থাকেন। ব্যক্তি (Person) এক্ষেত্রে একক সত্তা (Individual identity) হলেও তাঁর প্রযুক্ত, স্বরান্তরিত 'আমরা' ও 'আমাদের' (যেমন, 'আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি', 'আমাদের সরকার এটা করেছে' ইত্যাদি) আসলে 'আমি' ও 'আমার'-ই দ্যোতক। পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষাভাষীর নেতা-নেত্রী ক্ষেত্রেই এটা সমভাবে লক্ষগোচর হয়।

প্রসঙ্গত ইংরেজ সমাজে ভাষণের এ রীতি সম্পর্কে ধারণা নিতে Fowler-এর সুপ্রসিদ্ধ *Modern English Usage* থেকে নিম্নোক্ত জ্ঞাতব্য উদ্ধারযোগ্য। 'আমরা' (We) সর্বনামের প্রয়োগ সম্বন্ধে এতে বলা হয়েছে: "We is also used with indefinite reference in the following conventional uses:/..b When a monarch is using the first person (the so-called *royal* we). This practice is dying out, however. Queen Victoria is credited with the remark *We are not amused*, but Queen Elizabeth II is noted for *My husband and I* and generally uses the singular form when referring to herself."[১১] এ কথা সত্য যে, রাজকীয় ঘোষণায় এর প্রয়োগ বর্তমানে অনেকটা উঠে গিয়েছে (অবশ্য রাজা-রানিই বা আর আছে কোথায়? আর থাকলেও, তাদের আগের দিনের সে ধার-ভার তো দুটোই গেছে)। তবে, তা সত্ত্বেও ক্ষমতাধর ব্যক্তি (সেই ক্ষমতা de facto হোক, কি de jure) বিশেষ করে সরকার প্রধানগণ এখনও 'আমি'র স্থলে 'আমরা' পদের বহুবাচনিক প্রয়োগ করে থাকেন।

১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতা তো আসলে de facto ও de jure– দুটোই ছিল, ১৯৭১ সালে এর প্রয়োগ তিনি ঘটিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের একদা প্রধানমন্ত্রী, 'লৌহমানবী' রূপে খ্যাত মার্গারেট থ্যাচার (Margaret Thatcher)-ও স্বীয় ভাষণে, বক্তৃতায়, সম্প্রচারে অনেক ক্ষেত্রে 'আমরা' পদ ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনে এর ব্যবহার এখনও সুপ্রচলিত। Michael Swan-এর *Practical English Usage* সূত্রে জানা যায়, "In very informal British speech, *us* is quite often used instead of *me* (especially as an indirect object)."[১২] ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে *The Times* পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদসূত্রে জানা যায়, নিজের পিতামহী হওয়া প্রসঙ্গে জনগণকে জানাতে থ্যাচার জানিয়েছিলেন– *'We have become a grandmother.'* লক্ষণীয়, 'কর্তা' ব্যবহার করছেন বহুবচনের, অথচ 'কর্ম' একবচনের, তাহলে কি লৌহমানবী ভুল করেছিলেন? নিশ্চয়ই না। কর্তা বহুবচন এখানে আদতে একবচনেরই দ্যোতক, আলঙ্কারিক ও গভীরতা-সংজ্ঞাপক– দুই অর্থেই।

অন্যদিকে এ প্রবণতা শুধু যে মানবীয় ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তা নয়। একেশ্বরবাদী ধর্মশাস্ত্রগুলোতেও এটা দেখা যায়, যেখানে সৃষ্টিকর্তা একক সত্তা নির্দেশে 'আমি' ও 'আমরা'– দুটিই প্রয়োগ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুও 'আমি'-'আমরা'-র এ archaic ও figurative প্রয়োগ করেছেন। তবে সাধারণভাবে 'আমি' ব্যবহার করলেও যখন তাতে বলিষ্ঠতা ও নিশ্চিতি আনতে চেয়েছেন, তখন 'আমি' সর্বনামকে দুবার উচ্চারণেও কুণ্ঠিত হননি। যেমন বলেছেন, "আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।" এখানে 'আমি' ও 'আমরা' একে-অপরের পরিপূরক, তা বলাইবাহুল্য।

অন্যদিকে 'আমি' ও 'আমরা' সর্বনামের 'আমাদের' সর্বনামেরও ১০-বার প্রয়োগ দ্বারা জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধকে আরও গভীর ও আত্মিক করেছেন।

দুই. আগেই জানিয়েছি, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে 'তরে' অব্যয় পদ ব্যবহার করেছেন। এটি নিতান্ত কাব্যিক বা পদ্যগন্ধি একটি শব্দ, বাংলাসাহিত্যে তথা কবিতায় এর বহুলপরিচিত প্রয়োগ সম্ভবত 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'– কবি কামিনী রায় লিখিত এ চরণে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ প্রয়োগ খুবই পদ্যসন্নিষ্ঠ। স্বীকৃত গদ্যে, সাধু হোক কি চলিত ভাষায় এর প্রচলন নেই, উল্টো অবাঞ্ছিত, অপাঙ্‌ক্তেয় বলেই গণ্য। তাই আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত সকল কবিই অত্যন্ত সজ্ঞানে এর ব্যবহার এড়িয়ে চলেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। খোদ কবিগুরু তাঁর *পুনশ্চ* (আশ্বিন ১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহৃত হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।'

আধুনিক বাঙালি কবিদের স্বভাষার দীক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসুও একদা অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে পরে অনেকটা বাধ্য হয়ে আপোস করেছিলেন খানিকটা সরে এসে। আর একেবারে হাল যুগে বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ রবীন্দ্র-অভিমতে স্বস্থ হয়েছেন। যেমন বাংলা একাডেমী(ি) প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্যতম সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি ও ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এ ব্যাকরণগ্রন্থে তৎ-রচিত 'কাব্যভাষার ব্যাকরণ' নামীয় প্রবন্ধে 'কাব্যিক শব্দ' উপশিরোনামে যেসব শব্দ নিবন্ধিত করেছেন, তার 'অনুসর্গ' তালিকায় অন্যান্য শব্দ-মধ্যে 'তরে'ও উল্লেখ করেছেন। কারণ হিসেবে শুরুতেই তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "বাংলা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে 'কাব্যিক' (poetical) শব্দই কিছু লক্ষ করা যাবে। এগুলির গদ্যে বা মুখের ভাষার (ভাষায়?) ব্যবহার নেই, অন্তত প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় নেই বলেই এগুলি 'কাব্যিক'।[১৩]

কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, এই অতি পদ্যগন্ধি পদটি, কবিরা যাকে অচ্ছ্যুত, অস্পৃশ্য ঘোষণা করেছেন, 'অন্তত প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষায়' যার পঙ্‌ক্তিভোজ অসম্ভব বলেছেন

পণ্ডিতসমাজ, সেই 'তরে' অব্যয় বা 'অনুসর্গ'টিও যে গদ্যের সুস্বাদু ও ব্যঞ্জনাময় অবলম্বন হতে পারে, তা বঙ্গবন্ধুর আগে আর কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি, আধুনিক বাঙালি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক প্রমুখ তাঁদের রচনায় প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বলে জানা যায় না। ফলে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, পাকা জহুরীর হাতে পড়লে যা হয় এখানেও তাই হয়েছে, বাংলা গদ্যে ও লোক-ভাষণে এর অচিন্ত্য-অকল্পনীয় ও সার্থক, সম্ভবত একমাত্র (One and only) প্রয়োগ ৭ই মার্চের ভাষণটিতেই কেবল দীপ্যমান। বস্তুতপক্ষে বঙ্গবন্ধু যখন বলেন, "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট– যা যা আছে সব কিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।"– তখন ভাষণে 'তরে' শুধু অমোঘ, অবিকল্প ও সুচয়িত সন্নিবেশনই হয়ে দাঁড়ায় না, প্রমিত গদ্যভাষায় এটি প্রয়োগের নবদিগন্তও উন্মোচিত করে।

আরেকটি প্রায় কাব্যিক পদ তিনি ব্যবহার করেছেন, সেটি 'আপন'। এটির কাছাকাছি পদ 'আপনা'। প্রথমটিকে বিশেষণ এবং পরেরটিকে বিশেষ্য হিসেবে নিলে (এদের অন্যবিধ পদসোপান ও অর্থ রয়েছে) দুটিরই মানে দাঁড়ায় 'নিজ', 'স্বীয়' ইত্যাদি। শ্রীসরকার তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 'আপনা' পদটিকেও পদ্য বা কাব্যিক (স্মর্তব্য, 'চর্যাপদে'র 'আপণা মাংসে হরিণা বৈরী') বিবেচনায় গদ্যে পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রেও অনেক আগেই গদ্যে 'আপন' প্রয়োগের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। তিনি এর যথাপ্রয়োগ করেছেন এভাবে, "আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দ্যান/ দেন। জনগণ সাড়া দিলো। **আপন** ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।"

তিন. বঙ্গবন্ধু ভাষণে বেশ কিছু শব্দ বা পদ, বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, যা ঋদ্ধ বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদের ন্যায় তাঁর আশ্চর্য ভাষাজ্ঞানের ইঙ্গিত দেয়, যদিও স্বীকার্য, তিনি তা ছিলেন না। যেমন 'সঙ্গে' ও 'সাথে'– এ দুটো অব্যয় পদের কথা বলা যায়। দুটি সমার্থক বা একে-অপরের প্রতিশব্দ। ভাষাজ্ঞ-পণ্ডিতেরা সাধারণত 'সঙ্গে'-কে গদ্যে এবং 'সাথে'-কে কবিতায় বা পদ্যে ব্যবহারের বিধান দিয়ে থাকেন (পবিত্র সরকারের পূর্ববর্তী রচনা দ্রষ্টব্য)। হালে হায়াৎ মামুদও নিদান দিয়েছেন, "মোদ্দা কথা, গদ্যে 'সাথে' ব্যবহার ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ যদি নাও হয়, তা যে শৈলীগত ত্রুটি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই, 'সাথে' বর্জন করে 'সঙ্গে' লেখাই যুক্তিযুক্ত বলে আমাদের বিশ্বাস।"[১৪] বাংলা ভাষার আদি পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে গদ্য ভাষায় ও সাহিত্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে 'সঙ্গে' ব্যবহার উৎসাহিত এবং 'সাথে' নিরুৎসাহিত করা হয়। অবশ্য বাংলাদেশের গদ্যসাহিত্যে 'সাথে' বহুকাল আগে থেকেই সুপ্রচলিত (তুখোড় ভাষাবিজ্ঞানীগণও তা হামেশা ব্যবহার করেছেন, যেমন হুমায়ুন আজাদ)। এ সম্বন্ধে কবি-প্রাবন্ধিক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁর '*বাংলা প্রবন্ধ ও রচনা-রীতি*' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬২) প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট তথা 'শিষ্ট-প্রয়োগ নহে' বলে 'সাথে, মাঝে, হ'তে'– এগুলোকে 'গদ্যে চলিবে না' ঘোষণা করে, পরক্ষণেই কিছু ছাড় দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'প্রথমটি গদ্যে চলিবে–উহা এই (পূর্ববঙ্গ) অঞ্চলেরই প্রাচীন বুলি'।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবনের একটি উজ্জ্বলপর্ব পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতায় কেটেছিল (দ্রষ্টব্য তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*)। ধারণা করা যেতে পারে, পাঠ্যাবস্থায়-শ্রেণিতে এখানকার শিক্ষকদের এসংক্রান্ত ভাষাজ্ঞান তিনি পেয়ে থাকবেন। সম্ভবত এরই সচেতন প্রক্ষেপে ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি 'সঙ্গে' ৭-বার এবং 'সাথে' মাত্র ১-বার ব্যবহার করেছেন। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, প্রথমটির প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি রয়েছে, তবে অন্যটিকেও অনাদরণীয় মনে করেননি। যুগপৎ পশ্চিম ও পূর্ব– উভয় বঙ্গীয় ভাষারীতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

একই অবস্থা দেখি ভাষণে উচ্চারিত 'যেয়ে' ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে। অনেকে গদ্যে 'যেয়ে' না লিখে 'গিয়ে' লিখবার পরামর্শ দেন। ফলত 'গমন' থেকে যদি 'গিয়ে' হয়, তাহলে 'যাওয়া' ক্রিয়া থেকে 'যেয়ে' হওয়ায় আপত্তি থাকা অনুচিত। অন্তত পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে এ প্রয়োগ হামেশাই হয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধু এর যথাপ্রয়োগ ভাষণে দেখিয়েছেন– "২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।"

পাঁচ. তিনি যথার্থ ব্যাকরণিয়ার ন্যায় অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে স্থানাধিকরণে সপ্তমী (৭মী) বিভক্তির 'এ', 'য়', 'তে' প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন বলেছেন, 'প্রত্যেক **গ্রামে**, প্রত্যেক **মহল্লায়** আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো..।' প্রচলিত সূত্রানুসরণে 'অ'-স্বরান্ত্যপদে 'এ'/'ে' কার এবং 'আ'/'া' কার অন্ত্যপদে 'য়'-এর ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। তেমনি 'ই'/'ি' এবং 'ও'/'ো' কার স্বরান্ত্যপদে 'তে' ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, 'তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা **অ্যাসেম্বলিতে** বসতে পারব, কি পারব না?' কিংবা, 'যদি **রেডিওতে** আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙ্গালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না' ইত্যাদি। অন্যদিকে ভাষণের প্রায় সর্বত্র (যেখানে তা উচ্চারিত) ক্রিয়া-বিশেষণ ও বিশেষণ হিসেবে 'পরে', 'তারপরে', 'উপরে' ইত্যাদি উচ্চারণ করেছেন। এর ফলে এগুলোর এককার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত হয়েছে।

ভাষণের দু-এক ক্ষেত্রে নঞর্থক 'নাই' ক্রিয়াপদের সাধু বা পূর্ণ রূপ চলিত ভাষায় অর্থাৎ ভাষণে ব্যবহার করে এ অঞ্চলের প্রয়োগ বিশিষ্টতার স্বরূপ আরেকবার চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, "১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে **পারি নাই**।" লক্ষণীয়, গোটা বাক্যটি চলিত ভাষার, এর প্রমাণ 'করে' ও 'বসতে'– এ দুটি ক্রিয়াপদ। কিন্তু যখন স্বাভাবিকভাবে 'বসতে'-র পরে 'পারিনি' (একত্রে) বা 'পারি নি' (দুশব্দে) উচ্চারণ না করে 'পারি নাই' বলেন, তখন দৃশ্যত তা সাধুরূপ গ্রহণ করলেও পূর্ববঙ্গে এ জাতীয় সাধু-চলিতের মিশ্রণ কখনই দূষণীয় বিবেচিত হয়নি। বরং তা এখানকার ভাষার বৈশিষ্ট্য, যাতে সারল্য ও সৌন্দর্য দুটোই প্রকটিত হয়।

উদাহরণত বাংলাদেশের মহত্তম উপন্যাসগুলির একটি, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের প্রথম স্তবকের শুরুর ও শেষ বাক্য দুটি দেখা যায়, যা এ রকম– "শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা **নাবে নাই**।.. অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে

শোনে নাই।" বলাবাহুল্য, ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ তা দেখিয়েছেন কথাশিল্পে, বাঙালির অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী শেখ মুজিব তা দেখিয়েছেন বাক্-শিল্পে। সিদ্ধ মুন্সিয়ানায় তাই তিনি চলিত ও সাধু রূপের পাশাপাশি যুগলবন্দি ঘটিয়েছেন, "২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ **শুকায় নাই**।"

ছয়. বঙ্গবন্ধু তাঁর এ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণের ক্ষেত্রেও যে কী অসম্ভব পরিমিতিবোধ ও ঋদ্ধ বাক্পটুত্ব দেখিয়েছেন, তার প্রমাণ মেলে পৌনঃপুনিকতা দোষ এড়াতে তাঁর সতর্ক চেষ্টায় ও প্রযত্নে। ধরা যাক, 'সাল' শব্দটির কথা। বাঙালির ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন (এর অনেকখানি আগেও উদ্ধৃত হয়েছে): "১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে ১০ বচ্ছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।"

সাত. তিনি ছিলেন মঞ্জুভাষী কথাকোবিদ। এ 'মঞ্জুভাষ্' অবশ্য কণ্ঠের লালিত্যে নয় (পুরুষের তা সম্ভবও নয় প্রকৃতিগত কারণেই), বরং তাঁর নিজস্ব ঢঙ্ বা স্বকৃত বাচন শৈলীর জাদুতে, বিশেষত ক্রিয়াপদে, কখনও কখনও আঞ্চলিক টান বা কথ্যভাষার রসায়ন বা মিশেলে। স্বাদ নেয়া যাক, আলোচ্য ভাষণের এ নমুনাগুলো থেকে: 'আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র **তৈয়ের** করব'; 'রক্তের দাগ **শুকায়** নাই'; ' আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে **দেবার** চাই যে'; 'আমি যদি হুকুম **দিবার** নাও পারি'; 'কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি **চালাবার** চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে **দাবায়া** রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ তোমাদের দাবাতে পারবে না।'; 'মনে **রাখবা**, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।'

আট. আরেকটি ছোটো, দৃশ্যত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী প্রয়োগ করেছেন এই বাক্যে 'কাছে' পদ ব্যবহার করে: "আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।" স্মর্তব্য, তাঁর আলোচ্য ভাষণের কোনো কোনো লিখিত রূপে (যেমন, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬, পঞ্চম তফসিল, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত *সাহিত্য-কণিকা*, অষ্টম শ্রেণি, পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা ২৮-৩০)। উদ্ধৃত বাক্যস্থিত 'কাছে' পদের স্থলে 'হাতে' পাওয়া যায়; দায়িত্ব নিয়েই বলছি, যা তাঁর স্বকণ্ঠের ভাষণে আদৌ শ্রুত হয় না (ভাষণে শ্রুত হয় না এমন আরও কিছু প্রক্ষিপ্তি ও শব্দ ছাড় রয়েছে এ দুটোয়)। জানি না সংশ্লিষ্ট লিপিকারকেরা তা কোথায় পেয়েছেন? এদের অনুধাবনে এটা মোটেও আসেনি যে, 'হাতে' (বলছি না যে, 'হাতে' ভুল প্রয়োগ) এক্ষেত্রে একটি ব্যক্তিগত (Individual) বিষয়, যা মানব শরীরসম্বন্ধীয়, অন্যদিকে 'কাছে'

সামগ্রিকার্থ, সর্বাত্মক (Collectively), সমষ্টির কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর বুঝিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু জেনে-বুঝেই তা করেছেন, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার যা তা হলো ঐ চরম, টান টান, উত্তেজক মুহূর্তেও এসব খুঁটিনাটি ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় তাঁর তীক্ষ্ণ নজরদারিতে ছিল।

অনুরূপ সতর্কতা লক্ষ করি সংশয়জ্ঞাপক 'যদি' অব্যয় এবং এর সঙ্গে 'ও' অব্যয় অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রস্বর যোগে গঠিত, স্বতন্ত্র শব্দ শর্তযুক্ত 'যদিও' অব্যয়ের কারুকার্যময় স্থানিক ব্যবহারে। তাঁর নির্গলিত চিত্তের উদার আহ্বান, "আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি **এ** পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও **একজন** যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।"এখানে মোটাক্ষরিত 'এ' ও 'একজন'– এ দুটির সঙ্গেও 'ও' যোগ করা চলে, তাতেও বাক্যের অর্থের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে বলে মনে করি না। কিন্তু গোটা বাক্যে প্রযুক্ত প্রথমে 'যদি' ও শেষে 'যদিও' কথনে বক্তার মৌল উদ্দেশ্য অধিক সাধিত ও সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

নয়. মনে রাখতে হবে, এ ভাষণটি যখন মুখে মুখে বঙ্গবন্ধু 'রচনা' করছেন (একে সৃষ্টিশীল রচনাই বলব) তখন তিনি পূর্বপাকিস্তানের তথা পূর্ববাংলার (তাঁর কথায় বাংলাদেশেরও) অবিসংবাদিত নেতাই শুধু নন, 'পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টি'রও প্রধান, সেইসূত্রে অখণ্ড পাকিস্তানের আগামীদিনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা (যদি তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করত!)। কাজেই তিনি যখন সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন, তখন তাদের প্রতি 'তোমরা' সম্বোধন তাঁর পক্ষে অসঙ্গত ও অপ্রশাসনিক ছিল না। কেননা তাতে যুগপৎ নির্দেশ ও অনুরোধ– এ দুটো অনুজ্ঞারই প্রতিফলন ঘটে। প্রায় অনুরূপ নির্দেশ যখন সরকারি কর্মচারীদের দেন তখন তাতে দৃশ্যত অনুরোধ ফুটে উঠলেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন নির্দেশই।

কিন্তু অতঃপর মেহনতি জনতার প্রসঙ্গ যখন এসেছে (এখানে 'শ্রমিক' সাধারণ), তখন তাদের উদ্দেশে সম্ভ্রমার্থক 'আপনি' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। বস্তুত স্থান ও পাত্র ভেদে যথোপযুক্ত ভাষা তথা সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার– এও তাঁর ভাষিক বিশিষ্টতা। দেখা যাক, নীচে চয়িত নমুনারাজি।

সৈন্যদের উদ্দেশে– 'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।'

সরকারি কর্মচারীদের (রেডিও ও টেলিভিশনে কর্মরতরা-সহ) উদ্দেশে– 'সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।.. মনে রাখবেন রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না।'

মালিকদের উদ্দেশে কিন্তু শ্রমিকদের কল্যাণে– 'আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক

ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়া দেবেন।'

উপরের শেষের বাক্যটিতে প্রযুক্ত বিশেষণ পদ 'প্রত্যেকটা'– কথাটিও সুচিন্তিত প্রয়োগ বলতে হবে। কেননা এতে বক্তার কথায় অনুরোধের চেয়ে আদেশাত্মক জোর (Spirit) ভাস্বরিত হয়েছে। এটা বোঝা যাবে যদি শব্দটিকে ভাঙ্গা হয় এভাবে– 'প্রতি'+'এক'+'টা' (বাংলা প্রত্যয়, নির্দেশক পদ বা Article)।

দশ. এপর্যায়ে আলোচ্য ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে (যা আমাদের কাছে অনুভূত ও প্রতীয়মান হয়েছে, কিন্তু অন্যত্র অন্যভাবে লিপিকৃত) দু-এক কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব।

আমরা সকলেই জানি যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় (১৯২০ সালে), যা প্রাচীন ও মধ্যকালীন বাংলা বিবেচনায় মোটামুটি মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গের অন্তর্গত। বৃহত্তর বাংলার অন্যান্য ভূখণ্ডের ন্যায় এ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষারও (একে উপভাষা বলাই সঙ্গত) নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মূলত বিশেষার্থক শব্দ ব্যবহারে ও ক্রিয়াপদের টানে বা প্রস্বরে ধরা পড়ে। এর সামান্য নমুনা আগেই দেখানো হয়েছে।

যাই হোক, বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শ্রবণ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, তিনি 'বচ্ছর' (খাঁটি বাংলা সন্ধির নিয়মে 'বৎসর' থেকে উদ্ভূত), 'বাঙ্গালি' ('ঙ' যুক্ত কোমল ঢঙে 'বাঙালি' নয়, বরং 'বঙ্গ'+'আল'= বঙ্গাল-এর সাদৃশ্যে 'বাঙ্গালি', যা মোগল দরবারি ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি*তে উল্লিখিত 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' নামের উৎপত্তির সূত্রই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 'বঙ্গাল'-এর অধিবাসীই 'বাঙ্গালি'), 'এহিয়া' ('ইয়াহিয়া' থেকে, 'অভিশ্রুতি'র বা Umlaut-এর প্রভাবজনিত), 'ভায়েরা' ('ভাইয়েরা' থেকে) রূপে শ্রুত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গোটা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ এ চারটিকে এভাবেই উচ্চারণে অভ্যস্ত। বঙ্গবন্ধুও এ রীতিতেই উচ্চারণ করেছেন বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

লক্ষণীয়, ভাষণটির স্বতঃস্ফূর্ততার ভাষিক প্রমাণ এভাবেও প্রতিষ্ঠিত করা চলে– যেখানে চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে, লক্ষ লক্ষ উদ্বেল জনতার চাওয়া ও অন্তরালে হায়েনা চরিত্রের শাসকবর্গের রক্তচক্ষুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ১৮-মিনিট ধরে, কম-বেশি এগারো শত শব্দ উচ্চারণে বক্তা শুধু একবার উপযুক্ত শব্দচালনায় মুহূর্তিক দোলাচালে ছিলেন, আর সেটি ধরা পড়ে যখন তিনি বলেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপরে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপরে–কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' এখানে লক্ষণীয় 'লোকের উপরে' ও বিশেষত 'উপরে-কাছে' শব্দবন্ধ। এছাড়া পুরো ভাষণটিই শত ভাগ সুনিপুণ বাক্-সমৃদ্ধ ও সুঅভিব্যক্ত। এটি সুঅবিভক্ত ও সুচিন্তিত এভাবেও বোঝা যায়, গোটা ভাষণে 'ভায়েরা (ভাইয়েরা) আমার' সম্বোধন করেছেন দু-বার। প্রথমবারের পরে প্রায় আধাআধির একটু বেশি এসে– অর্থাৎ উচ্চারিত

কম-বেশি ১১০৫ শব্দের মধ্যে ৬০০ শব্দে এসে (এর পরে রয়েছে ৫০০-র কিছু বেশি শব্দ)। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এ সময় গণিতও সঙ্গোপনে ক্রিয়াশীল ছিল বঙ্গবন্ধুর মননে-চিন্তায়।

এগারো. বঙ্গবন্ধু আলোচ্য ভাষণে অঙ্ক (Numerals), তারিখ (Dates), পূরণ (Ordinals) ও গণনা (Cardinals) বাচক মিলিয়ে মোট ২০টি সংখ্যাশব্দ ব্যবহার করেছেন (পূর্ণ তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে কিছু তারিখ 'ই' যুক্ত করে (যেমন সাতই, দশোই, পনেরোই), আবার কিছু শুধু সংখ্যা উল্লেখ করে।

উপসংহারে একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি দিতে চাই। এটি অ্যাডল্‌ফ হিটলার (Adolf Hitler)-এর *Mein Kampf* থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম খলনায়ক, ঘৃণিত এই জার্মান শাসক বিশ্বব্যাপী ঘোর নিন্দিত হলেও (আমাদের কাছেও) তার বর্ণিত এ কথাটি অবশ্যই নন্দিত হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। তিনি যথার্থই বলেছেন, "I know that fewer people are won over by the written word than by the spoken word and that every great movement on this earth owes its growth to great speakers and not to great writers."[১৫]

উনিশশ' একাত্তর সালে ত্রিশ লক্ষ শহীদের অমূল্য প্রাণ এবং দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালির যে স্বাধীনতা অর্জন এবং এজন্য বছরের পর বছর যে দীর্ঘ, যূথবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রাম– 'great movement' হয়েছিল, তা সংঘটনের পিছনে যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর অবদান একক ও অনন্য, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বস্তুত ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে চূড়ান্ত ও বজ্রনির্ঘোষিত 'spoken word' দিয়েই তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

সুতরাং সব মিলিয়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নানা কারণে একটি অনবদ্য ও Superb ভাষাতাত্ত্বিক দলিল।[১৬]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত ও নোট্‌স লিখিত *Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh, My Bangladesh* : Selected Speeches and Statements, October 28, 1970 to March 26, 1971 গ্রন্থে বলা হয়েছে: '..at least one million eager Bengalees came to receive orders from their leader.' (দেখুন, ঐ, Ed. with Notes by Ramendu Majumdar, Orient Longman Limited, New Delhi, January, 1972, p. 91; আরও দেখুন, Mukhtadhara Edition of the same book containing Selected Speeches and Statements, October 28, 1970 to January 10, 1972, July 1972, p. 94.
পাকিস্তানের এককালীন বিমানবাহিনী প্রধান এবং পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনীতিক এম. আসগর খানও লিখেছেন, '..when the meeting started in the afternoon, the Race Course was a surging sea of humanity. Mujib spoke for eighteen minutes..' [দেখুন তাঁর, *We've*

Learnt Nothing From History Pakistan: Politics and Military Power, M. (Mohammad) Asghar Khan, The University Press Limited, Dhaka, 2006, p. 38].

২. ১৯৭১ সালের ১লা মে মুজিবনগরে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' শীর্ষক এক রচনার প্রারম্ভে লিখেছিলেন, "৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ভাষণের জবাবে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা-"এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" (তথ্য সংগৃহীত, *আমি মুজিব বলছি*, কৃত্তিবাস ওঝা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা চ)। উদ্ধারচিহ্নভুক্ত শেষোক্ত কথাগুলো মূল ভাষণে ঈষৎ ভিন্নভাবে লভ্য।

৩. দেখুন, Majumdar's *Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh, My Bangladesh,* p. 92.

কেউ কেউ অবশ্য ভাষণের স্থায়িত্বকাল ২২ মিনিট বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, *শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, শাহ্জাহান বিন্ মোহাম্মদ ও কাজী লতিফুর রহমান, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপু লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪৪৯।) বাজারে লভ্য ক্যাসেটে বা সিডিতে ভাষণটি ১২ মিনিট ধরে শ্রুত হয়।

৪. তাঁর রচনা; তথ্য সংগৃহীত, *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ/ ইতিহাস* ও তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, আবদুল ওয়াহাব সংকলিত ও সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৫. মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ প্রকাশিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও ঘটনা* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত তাঁর প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৪৫।

৬. *The Colonel Who Would Not Repent The Bangladesh War And Its Unquiet Legacy,* Salil Tripathi, Aleph Book Company, New Delhi, 2014, pp. 70-71.

৭. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বয়ং ২৫-২৬ দিবাগত মধ্যরাতে (বন্দি হওয়ার কিছু আগে) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাসম্পর্কিত বিদেশি লেখকদের গ্রন্থ, পত্রিকাস্থ সমকালীন তথ্য ও সংবাদাদি জানার জন্য দেখুন, *International Herald Tribune*, March 27 & 28, 1971; *The Statesman*, March 27 (*Bangla Desh Documents*, Vol. I, pp. 280-81; *The Sunday Standard*, April 18, 1971; *Newsweek*, April 5, 1971; *The Daily Telegraph*, April 3, 1971; *World Meet on Bangla Desh: Report of the International Conference on Bangla Desh*, ed. Ranjit Gupta & Radhakrishna, New Delhi, pp. 267-68; *Bangla Desh—Birth of A Nation*, Yatindra Bhatnagar, New Delhi, 1971, p. 335; *Bangladeh*, June 16, 1971; *Pakistan Crisis*, David Losakh, London, 1971, p. 89; *Not the Whole Truth East Pakistan Crisis (March-December 1971) Role of the Foreign Press*, ed. Mirza Sarfaraz Hussain, University of Punjab, Pakistan, 1989, p. 18; *US Document on the Liberation War of Bangladesh*/ The Government of U.S.A. Defense Intelligence Agency/ Operational Intelligence Division/ DI-2/ DIA/ Spot Report (এ থেকে জানা যায়, ২৬/৩/১৯৭১ তারিখ ১৪:৩০ সময়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয় জানিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস স্বদেশে হোম ডিপার্টমেন্টে বার্তা পাঠিয়েছিল– এটি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি বড়ো, নির্ভরযোগ্য প্রমাণ)। এ বিষয়ে আরও জানতে দেখা যেতে পারে, মৎপ্রণীত স্বাধীনতা ঘোষণা : একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭। এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তৎকালীন (অধুনালুপ্ত) সরকারি পত্রিকা দৈনিক বাংলা, ৯ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যায় (১৬/১২/১৯৭২) DECLARATION OF WAR OF INDEPENDENCE BY BANGABANDHU SK. MUJIBUR RAHMAN শীর্ষক বক্স নিউজের নীচে তৃতীয় বন্ধনীতে প্রথমেই (পরে 'Pak army.. May Allah bless you. JOY BANGLA' ঘোষণাটি ছিল) যা লেখা হয়েছিল সেটি তুলে ধরা হলো, যা এ রকম:

"A historic message from Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman conveyed to Mr. Zahur Ahmed Chowdhury on 25th March, 1971 at 13.30 Hours—immediate after crack-down of Pak Army."

৮. তথ্য সংগৃহীত, *একটি জাতির জন্ম*, মেজর জেনারেল জিয়ায়ুর [যথাপ্রাপ্ত] রহমান, অধুনালুপ্ত *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৬শে মার্চ ১৯৭৪ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা।

৯. *বাংলাদেশের জন্ম*, মূল রাও ফরমান আলী খান; ভূমিকা মুনতাসীর মামুন ও অনুবাদ শাহ আহমদ রেজা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৯৫।

১০. দেখুন, *The Betrayal of East Pakistan,* Lt-Gen (R) A. A. K. Niazi, Oxford University Press, Karachi, Pakistan, 1998, p. 43. লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান খানও তার *Memoirs of Lt. Gen. Gul Hassan Khan* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "The Sheikh had triumphed on all counts—he had maneuvered the clashes in Dhaka between the troops and his mobs; he had stopped the flow of reinforcements to the East, and most agreeable of all, law and order in Dhaka would henceforth be his responsibility." (দেখুন, *Memoirs,* Oxford University Press, Karachi, Pakistan, 1993, p. 264).

১১. দেখুন, *Oxford Pocket Fowler's Modern English Usage,* Edited by Robert Allen, Second Edition, Oxford University Press, Paperback, 2008, p. 644.

১২. দেখুন, *Practical English Usage,* Michael Swan, Oxford University Press, Third Edition, Fourth Impression, New Delhi, 2007, p. 405.

১৩. দেখুন, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী(ি), প্রথম ২০১১, পৃষ্ঠা ২৬৯-৭০।

১৪. বাংলা লেখার নিয়ম-কানুন : বানান ও ভাষারীতির গাইড-বুক, হায়াৎ মামুদ, প্রতীক, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১০৪।

১৫. দেখুন, *100 Significant Pre-Independence Speeches 1858-1947,* Compiled and edited by H. D. Sharma, Rupa & Co., New Delhi, 2007, see Preface.

১৬. এক নজরে ভাষাতাত্ত্বিক কতিপয় দিক জানতে দেখুন, এই রচনার সঙ্গে সংযোজিত– ''বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ– ক, খ ও গ''।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ– ক

[কোন্ শব্দ কত বার ব্যবহৃত (বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে) : বর্ণানুক্রমিকভাবে]

অক্ষরে (১)/ অত্যাচারের (১)/ অধিকার (২)/ অধিবেশন (১)/ অনির্দিষ্টকালের (১)/ অনুরোধ (২)/ অনেক (২)/ অন্যান্য (২)/ অন্যায় (১)/ অর্থনৈতিক (১)/ অস্ত্র (২)/ অ্যাসেম্বলি (৭)/ অ্যাসেম্বলিতে (৬)/ অ্যাসেম্বলির (১)/ আইন (১)/ আওয়ামী (৩)/ আক্রমণ (১)/ আগেই (১)/ আঘাতপ্রাপ্ত (১)/ আছে (৬)/ আজ (৬)/ আত্মকলহ (১)/ আদালত (১)/ আন্দোলনে (২)/ আপন (১)/ আপনাদের (২)/ আপনারা (৪)/ আপনি (৩)/ আমার (১৫)/ আমরা (২০)/ আমাকে (২)/ আমাদের (১০)/ আমার (৬)/ আমি (১৮)/ আয়ুব (২)/ আর্তনাদের (১)/ আর (৬)/ আরটিসিতে (১)/ আরো (২)/ আলাপ (২)/ আলোচনা (৩)/ আলোচনার (১)/ আসবেন (১)/ আসলেন (১)/ আসুন (২)/ আসে (২)/ ইচ্ছায় (১)/ ইতিহাস (৭)/ ইনশাআল্লাহ্ (১)/ উঠল (১)/ উপর (৪)/ উপরে (৭)/ এ (৬)/ এই (৭)/ এক (১)/ একটা (১)/ একজন (১)/ এখানে (৩)/ এবং (৫)/ এবারের (২)/ এমনকি (১)/ এর (২)/ এরপরে (১)/ এসেছিলেন (১)/ এহিয়া (৪)/ ঐ (১)/ ওয়াপদা (১)/ কথা (৬)/ কনফারেন্স (১)/ কমিটিকে (১)/ কর্মচারীদের (১)/ কর্মচারীরা (২)/ করতে (৬)/ করব (৩)/ করবে (২)/ করবেন (১)/ করলাম (২)/ করলেন (১)/ করা (৮)/ করাচি (১)/ করার (৩)/ করি (১)/ করুণ (১)/ করুন (১)/ করে (১৮)/ করেও (১)/ করেছে (১)/ করেছি (৪)/ করেছিলাম (১)/ করেছেন (৩)/ করেন (১)/ করো (১)/ কল (২)/ কলকারখানা (১)/ কষ্ট (২)/ কসাইখানা (১)/ কাজ (১)/ কাছারি (১)/ কাছে (২)/ কার (১)/ কাল (১)/ কিছু (৬)/ কি-না (১)/ কিনেছি (১)/ কিন্তু (৪) কী (৪)/ কীভাবে (১)/ কীসের (১)/ কেউ (৫)/ কোটি (১)/ কোনো (৩)/ কোর্ট (২)/ কোল (১)/ ক্ষমতা (১)/ ক্ষমতায় (১)/ খতম (১)/ খাজনা (১)/ খান (৫)/ খানের (১)/ খালি (১)/ খুলনা (১)/ খোলা (১)/ গড়ে (৩)/ গণতন্ত্র (১)/ গদিতে (১)/ গভর্নমেন্ট (১)/ গরিব (১)/ গরিবের (২)/ গাড়ি (১)/ গুলি (৫)/ গেল (১)/ গেলেন (১)/ গোপনে (১)/ গোলাম (১)/ গ্রামে (১)/ ঘরে (২)/ ঘন্টা (২)/ ঘোড়ার (১)/ চট্টগ্রাম (১)/ চলবে (৮)/ চলে (১)/ চাই (৩)/ চায় (৩)/ চালান (১)/ চালাবার (১)/ চালিয়ে (১)/ চেষ্টা (৫)/ ছাড়ব (১)/ ছেলেদের (১)/ জজকোর্ট (১)/ জন (১)/ জনগণ (২)/ জনগণের (১)/ জনাব (১)/ জন্য (৩)/ জয় (১)/ জয়লাভ (১)/ জাতীয় (১)/ জানেন (১)/ জারি (১)/ জিনিসগুলো (১)/ জীবন (১)/ জীবনের (১)/ জুনে (১)/ জেনারেল (১)/ জোর (১)/ ঝাঁপিয়ে (১)/ টাকা (১)/ টেবিল (২)/ টেলিগ্রাম (১)/ টেলিফোন (১)/ টেলিফোনে (১)/ টেলিভিশন (১)/ টেলিভিশনে (১)/ টেলিভিশনের (১)/ ট্যাঙ (১)/ ঠিক (১)/ ডেকেছিলেন (১)/ ঢাকা (১)/ ঢুকেছে (১)/ তখন (১)/ তখনই (১)/ তদন্ত (১)/ তরে (১)/ তা (১)/ তাই (২)/ তাকে (৩)/ তাদের (৫)/ তার (৫)/ তারপর (১)/ তারপরে (৪)/ তারা (৩)/ তারিখে (৬)/ তাহলে (৩)/ তিনি (১০)/ তুলব (১)/ তৈয়ার (১)/ তৈয়ের (১)/ তো (১)/ তোমরা (৩)/ তোমাদের (৫)/ তোলো (২)/ থাকবে (২)/ থাকো (২)/ থেকে (৭)/ দপ্তরগুলো (১)/ দফা

(১)/ দুর্গ (১)/ দরজা (১)/ দাগ (১)/ দাবাতে (১)/ দাবায়া (১)/ দাবি (১)/ দায়িত্ব (১)/ দিতে (১)/ দিন (১)/ দিবার (১)/ দিবেন (১)/ দিয়ে (৪)/ দিয়েছি (৪)/ দিয়েছেন (২)/ দিলো (১)/ দুঃখ (১)/ দুঃখী (১)/ দুঃখের (৩)/ দেওয়া (৬)/ দেখব (১)/ দেখা (১)/ দেখুন (১)/ দেখে (১)/ দেবার (২)/ দেবে (১)/ দেবেন (৩)/ দেবো (১)/ দেশকে (২)/ দেশে (১)/ দেশের (৮)/ দেন (৩)/ দেবে (১)/ দেয় (১)/ দেয়া (২)/ দোকান (১)/ দোষ (৩)/ নন-বাঙ্গালি (১)/ নয় (১)/ নর (১)/ না (২৫)/ নাই (২)/ নাও (১)/ নাকি (১)/ নারীর (১)/ নিউজ (১)/ নিজেদের (১)/ নিয়ে (৪)/ নিয়েছে (১)/ নির্বাচন (১)/ নির্বাচনে (১)/ নির্বাচনের (১)/ নিরস্ত্র (১)/ নিলাম (১)/ নিলেন (১)/ নেতা (১)/ নেতাদের (১)/ নেতৃত্বে (১)/ নেব (১)/ নেবার (১)/ নেয়া (১)/ ন্যায্য (২)/ ন্যাশনাল (১)/ পড়ল (১)/ পড়েছেন (১)/ পতন (১)/ পর্যন্ত (৪)/ পর (১)/ পরামর্শ (১)/ পরিষদ (১)/ পরিষদের (১)/ পরিষ্কার (১)/ পরে (২)/ পশ্চিম (৩)/ পয়সা (২)/ পয়সাও (১)/ পাঁচ (১)/ পাকিস্তানে (১)/ পাকিস্তানের (৫)/ পাড়া (১)/ পানিতে (১)/ পাবে (১)/ পার্টির (১)/ পারব (২)/ পারবা (১)/ পারবে (২)/ পারি (৪)/ পারে (২)/ পারেন (১)/ পালন (১)/ পূর্ব (২)/ পূর্বে (১)/ প্রথম (২)/ পেলাম (১)/ পেশোয়ার (১)/ পৌঁছায়া (১)/ পৌঁছিয়ে (১)/ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (১)/ প্রতিনিধির (১)/ প্রতিষ্ঠান (১)/ প্রতিবাদমুখর (১)/ প্রত্যেক (৩)/ প্রত্যেকটা (১)/ প্রধানমন্ত্রিত্ব (১)/ প্রেসিডেন্ট (৩)/ প্রস্তুত (১)/ ফেব্রুয়ারি (১)/ ফেরত (১)/ ফেলে (১)/ ফৌজদারি (১)/ বক্তৃতা (১)/ বচ্ছর (১)/ বচ্ছরের (২)/ বদনাম (১)/ বন্ধ (৯)/ বলতে (১)/ বলবে (১)/ বললাম (৭)/ বললেন (৬)/ বলি (২)/ বলে (৫)/ বলেছিলাম (১)/ বসতে (৩)/ বসব ৩)/ বসবে (১)/ বসুন (১)/ বহিঃশত্রুর (১)/ বাঁচতে (১)/ বাংলা (৩)/ বাংলাদেশে (১)/ বাংলায় (২)/ বাংলার (৯)/ বাংলাদেশের (১)/ বাঙ্গালি (৩)/ বাঙ্গালিরা (২)/ বাহিনীর (১)/ বিচার (১)/ বিদেশের (১)/ বিবেচনা (১)/ বিষয় (২)/ বিরুদ্ধে (১)/ বুকের (৪)/ বুঝে (১)/ বেতন (৩)/ বেরিয়ে (৪)/ বেশি (১)/ বৈঠক (১)/ বোঝেন (১)/ ব্যবহার (১)/ ব্যাংক (১)/ ব্যারাকে (২)/ ভাই (২)/ ভাইরা (১)/ ভায়েরা (২)/ ভাইয়ের (১)/ ভাতে (১)/ ভুট্টো (৩)/ ভোট (১)/ ভারাক্রান্ত (১)/ মধ্যে (১২)/ মন (১)/ মনে (৩)/ মরতে (১)/ মহল্লায় (১)/ মাইনাপত্র (১)/ মানতে (২)/ মানুষ (৭)/ মানুষকে (৫)/ মানুষের (৭)/ মায়ের (১)/ মার্চ (১)/ মার্শাল (২)/ মারব (২)/ মালিক (১)/ মাসে (১)/ মুক্ত (১)/ মুক্তি (৩)/ মুক্তির (১)/ মুজিবুর (১)/ মুমূর্ষু (১)/ মুসলমান (১)/ মেজরিটি (১)/ মেনে (২)/ মেম্বাররা (১)/ মেরে (১)/ মোকাবেলা (১)/ যখন (৩)/ যখনই (১)/ যদ্দূর (১)/ যদি (১০)/ যদিও (১)/ যা (৫)/ যাতে (৩)/ যান (১)/ যাব (১)/ যাবার (২)/ যাবে (১)/ যাবেন (৩)/ যারা (৩)/ যে (১১)/ যেন (১)/ যেভাবে (১)/ যেয়ে (১)/ যোগদান (২)/ রইল (১)/ রক্ত (৫)/ রক্তে (১)/ রক্তের (৩)/ রক্ষা (১)/ রক্ষার (১)/ রংপুরে (১)/ রঞ্জিত (২)/ রহমান (১)/ রাউন্ড (২)/ রাখতে (১)/ রাখবা (১)/ রাখবেন (২)/ রাখলেন (২)/ রাজনীতি (১)/ রাজনৈতিক (১)/ রাজপথ (২)/ রাজশাহী (১)/ রাস্তাঘাট (১)/ রাস্তায় (১)/ রিস্ত (১)/ রিলিফ (১)/ রেখেছে (১)/ রেডিও (২)/ রেডিওতে (১)/ রেল (১)/ ল' (২)/ লঞ্চ (১)/ লুটতরাজ (১)/ লোক (১)/ লোকদের (১)/ লোকের (১)/ লীগকে (১)/ লীগের (২)/ শত্রুবাহিনী (১)/ শত্রুর (১)/ শহিদ (১)/

শহিদের (১)/ শান্তিপূর্ণভাবে (২)/ শাসনতন্ত্র (৩)/ শিক্ষা (১)/ শিখেছি (১)/ শিল্পের (১)/ শুকায় (১)/ শুধু (২)/ শুনে (১)/ শোনে (১)/ শোনেন (১)/ শ্রমিক (১)/ সংগ্রাম (৫)/ সঙ্গে (৭)/ সদস্য (১)/ সপ্তাহে (১)/ সব (২)/ সবই (১)/ সমস্ত (৪)/ সম্পূর্ণভাবে (১)/ সরকার (১)/ সরকারি (১)/ সংখ্যাগুরু (১)/ সংখ্যায় (১)/ সংগ্রাম (২)/ সাড়া (১)/ সাংস্কৃতিক (১)/ সামনে (১)/ সামরিক (২)/ সামান্য (১)/ সাথে (১)/ সালে (৩)/ সালের (১)/ সাহায্য (১)/ সাহেব (৫)/ সাহেবের (২)/ সুপ্রীম (১)/ সৃষ্টি (১)/ সে (১)/ সেই (১)/ সেইজন্য (১)/ সেক্রেটারিয়েট (১)/ সেখানে (১)/ সেগুলো (১)/ সেমি (১)/ স্টেশনে (১)/ স্বাধীনতার (১)/ স্বীকার (১)/ স্থির (১)/ হওয়ার (১)/ হচ্ছে (২)/ হঠাৎ (৩)/ হতে (১)/ হত্যা (৪)/ হবে (১৪)/ হয় (৮)/ হয়ে (২)/ হয়েছি (১)/ হয়েছে (৮)/ হরতাল (২)/ হরতালে (১)/ হলেও (১)/ হলো (৭)/ হস্তান্তর (১)/ হাইকোর্ট (১)/ হাজির (১)/ হিন্দু (১)/ হিসেবে (১)/ হিসাবে (১)/ হুকুম (১)/ withdraw (১)

১/২/৬ /৭/ ৭/ ৭ই / ১০/১০/১০ই/১৫ই/ ২৩/ ২৩/ ২৫/২৮/৩৫/১৯৫২/ ১৯৫৪/ ১৯৫৮/ ১৯৬৬/ ১৯৬৯

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ– খ

ব্যাকরণের নানা দিক ও অন্যান্য

বিভক্তিযুক্ত

এ= অক্ষরে/ গ্রামে/ জুনে/ টেলিফোনে/ টেলিভিশনে/ তারিখে/ দেশে/ নির্বাচনে/ পাকিস্তানে/ বাংলাদেশে/ ব্যারাকে/ ভাতে/ মাসে/ রক্তে/ রংপুরে/ সপ্তাহে/ সালে/ স্টেশনে/ হরতালে/ হিসাবে

য়= বাংলায়/ মহল্লায়/ রাস্তায়/ শুকায়/ সংখ্যায়

তে= অ্যাসেম্বলিতে/ আরটিসিতে/ গদিতে/ পানিতে/ রেডিওতে

র= অ্যাসেম্বলির/ আলোচনার/ ঘোড়ার/ নারীর/ পার্টির/ প্রতিনিধির/ বাংলার/ বাহিনীর/ মুক্তির/ রক্ষার/ শত্রুর/ স্বাধীনতার/ হওয়ার

এর= অত্যাচারের/ অনির্দিষ্টকালের/ আর্তনাদের/ খানের/ গরিবের/ জনগণের/ টেলিভিশনের/ দুঃখের/ দেশের/ নির্বাচনের/ পরিষদের/ পাকিস্তানের/ বচ্ছরের/ বাংলাদেশের/ বিদেশের/ বুকের/ ভাইয়ের/ মানুষের/ মায়ের/ লীগের/ রক্তের/ লোকের/ শহিদের/ শিল্পের/ সালের/ সাহেবের

২য়া/ কে= কমিটিকে/ দেশকে/ মানুষকে/ লীগকে

ইং+বাং= নন-বাঙ্গালি

ইংরেজি শব্দ= অ্যাসেম্বলি (Assembly)/ আরটিসি (RTC= Round Table Conference)/

ওয়াপদা (WAPDA=W&PDA)/ কনফারেন্স (Conference)/ কমিটি (Committee)/ গভর্নমেন্ট (Government)/ জজকোর্ট (Judge Court)/ জুন (June)/ জেনারেল (General)/ টেবিল (Table)/ টেলিগ্রাম (Telegram)/ টেলিফোন (Telephone)/ টেলিভিশন (Television)/ ট্যাক্স (Tax)/ নিউজ (News)/ ন্যাশনাল (National)/ পার্টি (Party)/ প্রেসিডেন্ট (President)/ ফেব্রুয়ারি (February)/ ব্যাংক (Bank)/ ব্যারাক (Barrack)/ ভোট (Vote)/ মার্চ (March)/ মার্শাল (Martial)/ মেজরিটি (Majority)/ মেম্বার (Member)/ রাউন্ড (Round)/ রিলিফ (Relief)/ রেডিও (Radio)/ রেল (Rail)/ ল' (Law)/ লঞ্চ (Launch)/ সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court)/ সেক্রেটারিয়েট (Secretariat)/ সেমি (Semi)/ স্টেশন (Station)/ হাইকোর্ট (High Court)/ উইথ ড্র (With draw)

আরবি-ফারসি= আইন/ আওয়ামী/ আদালত/ ইনশাআল্লাহ্/ করাচি/ কসাইখানা/ কাছারি/ খতম/ খাজনা/ খান/ খালি/ গদি/ গরিব/ গোলাম/ চালান/ জনাব/ জারি/ জিনিস/ জোর/ তদন্ত/ তারিখ/ দপ্তর/ দফা/ দরজা/ দাগ/ দাবি/ দোকান/ ফেরত/ ফৌজদারি/ বদনাম/ বেতন/ বেশি/ মহল্লা/ মালিক/ মুজিবুর/ মুসলমান/ মোকাবেলা/ রহমান/ শহিদ/ সপ্তাহ/ সরকার/ সরকারি/ সাল/ সাহেব/ হাজির/ হিন্দু/ হিসাব/ হুকুম

পর্তুগিজ= নিলাম (মূল Leilao)

জাপানি= রিক্স (মূল Jin অর্থ man; Riki অর্থ power, Sha অর্থ vehicle)

হিন্দি= গুলি (গোলি), পয়সা (?)

গুজরাটি= হরতাল

সংস্কৃত/ হিন্দি= পানি

ইংরেজি+ফারসি= কলকারখানা (কল-কারখানা)

সংস্কৃত+ফারসি= লুটতরাজ (লুট+তরাজ)

ফারসি+সংস্কৃত= মাইনাপত্র (মাহিনা+পত্র)

জাতিনাম= মুসলমান/ হিন্দু

ব্যক্তিনাম= আয়ুব বা আইয়ুব খান/ এহিয়া বা ইয়াহিয়া খান/ ভুট্টো/ মুজিবুর রহমান

স্থাননাম= করাচি/ খুলনা/ চট্টগ্রাম/ ঢাকা/ পেশোয়ার/ রংপুর/ রাজশাহী

দেশনাম= পশ্চিম পাকিস্তান/ পূর্ববাংলা/ বাংলা/ বাংলাদেশ

জন্তু নাম= ঘোড়া

ইংরেজি মাস নাম= ফেব্রুয়ারি/ মার্চ

কথ্য/ আঞ্চলিক= তৈয়ের/ দাবাতে/ দাবায়া/ দিবার/ দেবার/ নাও/ নেবার/ পারবা/ পৌঁছায়া/ মায়নাপত্র/ যাবার/ যেয়ে/ রাখবা

সংখ্যা= ১/ ২/ ৬ /৭/ ৭/ ৭ই / ১০/ ১০/ ১০ই/ ১৫ই/ ২৩/ ২৩/ ২৫/ ২৮/ ৩৫/ ১৯৫২/ ১৯৫৪/ ১৯৫৮/ ১৯৬৬/ ১৯৬৯

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ- গ

পদবিন্যাস

বিশেষ্য

অক্ষর/ অত্যাচার/ অধিকার/ অধিবেশন/ অনুরোধ/ অস্ত্র/ অ্যাসেম্বলি/ আইন/ আওয়ামী/ আক্রমণ/ আজ/ আত্মকলহ/ আদালত/ আন্দোলন/ আয়ুব/ আর্তনাদ/ আরটিসি/ আলাপ/ আলোচনা/ ইচ্ছা/ ইতিহাস/ ইনশাআল্লাহ্/ এহিয়া/ ওয়াপদা/ কথা/ কনফারেন্স/ কমিটি/ কর্মচারী/ করাচি/ কল/ কলকারখানা/ কষ্ট/ কসাইখানা/ কাজ/ কাছারি/ কোল/ ক্ষমতা/ খতম/ খাজনা/ খান/ খুলনা/ গণতন্ত্র/ গদি/ গভর্নমেন্ট/ গরিব/ গাড়ি/ গুলি/ গোলাম/ গ্রাম/ ঘর/ ঘণ্টা/ ঘোড়া/ চট্টগ্রাম/ চালান/ চেষ্টা/ ছেলেদের/ জজকোর্ট/ জন/ জনগণ/ জনাব/ জয়/ জয়লাভ/ জারি/ জিনিসগুলো/ জীবন/ জুন/ জেনারেল/ জোর/ টাকা/ টেবিল/ টেলিগ্রাম/ টেলিফোন/ টেলিভিশন/ ট্যাক্স/ ঢাকা/ তদন্ত/ তারিখ/ দপ্তরগুলো/ দফা/ দুর্গ/ দরজা/ দাগ/ দাবি/ দায়িত্ব/ দুঃখ/ দেশ/ দোকান/ দোষ/ নন-বাঙ্গালি/ নর/ নারী/ নিউজ/ নির্বাচন/ নেতা/ নেতৃত্ব/ পতন/ পরামর্শ/ পরিষদ/ পয়সা/ পাকিস্তান/ পানি/ পার্টি/ পূর্ব/ পেশোয়ার/ প্রতিনিধি/ প্রতিষ্ঠান/ প্রধানমন্ত্রিত্ব/ প্রেসিডেন্ট/ ফেব্রুয়ারি/ বক্তৃতা/ বচ্ছর/ বদনাম/ বহিঃশত্রু/ বাংলা/ বাংলাদেশ/ বাঙ্গালি/ বাহিনী/ বিচার/ বিদেশ/ বিবেচনা/ বিষয়/ বুক/ বেতন/ বৈঠক/ ব্যবহার/ ব্যাংক/ ব্যারাক/ ভাই/ ভাইরা/ ভায়েরা/ ভাত/ ভুট্টো/ ভোট/ মন/ মহল্লা/ মায়নাপত্র/ মানুষ/ মা/ মার্চ/ মুসলমান/ মালিক/ মাস/ মুক্তি/ মুজিবুর/ মেজরিটি/ মেম্বার/ মোকাবেলা/ যোগদান/ রক্ত/ রক্ষা/ রংপুর/ রহমান/ রাউন্ড/ রাজনীতি/ রাজপথ/ রাজশাহী/ রাস্তাঘাট/ রাস্তা/ রিক্সা/ রিলিফ/ রেডিও/ রেল/ ল'/ লঞ্চ/ লুটতরাজ/ লোক/ লীগ/ শত্রুবাহিনী/ শত্রু/ শহিদ/ শাসনতন্ত্র/ শিক্ষা/ শিল্প/ শ্রমিক/ সংগ্রাম/ সদস্য/ সপ্তাহ/ সরকার/ সংখ্যাগুরু/ সংখ্যা/ সংগ্রাম/ সাড়া/ সাল/ সাহায্য/ সাহেব/ সুপ্রীম কোর্ট/ সৃষ্টি/ সেক্রেটারিয়েট/ স্টেশন/ স্বাধীনতা/ স্বীকার/ হত্যা/ হরতাল/ হস্তান্তর/ হাইকোর্ট/ হিন্দু/ হুকুম

সর্বনাম

আপনাদের/ আপনারা/ আপনি/ আমার/ আমরা/ আমাকে/ আমাদের/ আমার/ আমি/ এ/ এই/ ঐ/ তাকে/ তাদের/ তার/ তারা/ তিনি/ তোমরা/ তোমাদের/ নিজেদের/ যা/ যারা/ যে/ সে/ সেই/ সেগুলো

বিশেষণ

অনির্দিষ্টকাল/ অনেক/ অন্যান্য/ অন্যায়/ অর্থনৈতিক/ আগেই/ আঘাতপ্রাপ্ত/ আপন/ আরো/ এক/ একটা/ একজন/ এখানে/ এবার/ এর/ এরপরে/ করুণ/ কাছে/ কার/ কিছু/ কেউ/ কোটি/ কোনো/ খালি/ খোলা/ গড়ে/ গোপন/ জাতীয়/ ঠিক/ তখন/ তখনই/ তারপর/ তারপরে/ দুঃখী/ নিরস্ত্র/ ন্যায্য/ ন্যাশনাল/ পরিষ্কার/ পরে/ পশ্চিম/ পাঁচ/ পূর্বে/

প্রথম/ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ/ প্রতিবাদমুখর/ প্রত্যেক/ প্রত্যেকটা/ ফৌজদারি/ বন্ধ/ বিরুদ্ধে/ ভারাক্রান্ত/ মধ্যে/ মার্শাল/ মুক্ত/ মুমূর্ষু/ যখন/ যখনই/ যেভাবে/ রঞ্জিত/ রাজনৈতিক/ শান্তিপূর্ণভাবে/ সব/ সবই/ সমস্ত/ সম্পূর্ণভাবে/ সরকারি/ সাংস্কৃতিক/ সামনে/ সামরিক/ সেখানে/ সেমি/ স্থির/ হাজির/ বেশি/ সামান্য/ হঠাৎ

ক্রিয়া

আছে/ আসবেন/ আসলেন/ আসুন/ আসে/ উঠল/ এসেছিলেন/ করতে/ করব/ করবে/ করবেন/ করলাম/ করলেন/ করা/ করার/ করি/ করুন/ করে/ করেও/ করেছে/ করেছি/ করেছিলাম/ করেছেন/ করেন/ করো/ কিনেছি/ গেল/ গেলেন/ চলবে/ চলে/ চাই/ চায়/ চালাবার/ চালিয়ে/ ছাড়ব/ জানেন/ ঝাঁপিয়ে/ ডেকেছিলেন/ ঢুকেছে/ তুলব/ তৈয়ার/ তৈয়ের/ তোলো/ থাকবে/ থাকো/ থেকে/ দাবাতে/ দাবায়া/ দিতে/ দিন/ দিবার/ দিবেন/ দিয়ে/ দিয়েছি/ দিয়েছেন/ দিলো/ দেওয়া/ দেখব/ দেখা/ দেখুন/ দেখে/ দেবার/ দেবে/ দেবেন/ দেবো/ দেন/ দেবে/ দেয়/ দেয়া/ নয়/ না/ নাই/ নাও/ নিয়ে/ নিয়েছে/ নিলাম/ নিলেন/ নেব/ নেবা/ নেয়া/ পড়ল/ পড়েছেন/ পাড়া/ পাবে/ পারব/ পারবা/ পারবে/ পারি/ পারে/ পারেন/ পালন/ পেলাম/ পৌঁছায়া/ পৌঁছিয়ে/ প্রস্তুত/ ফেরত/ ফেলে/ বলতে/ বলবে/ বললাম/ বললেন/ বলি/ বলে/ বলেছিলাম/ বসতে/ বসব/ বসবে/ বসুন/ বাঁচতে/ বুঝে/ বেরিয়ে/ বোঝেন/ মরতে/ মানতে/ মারব/ মেনে/ মেরে/ যান/ যাব/ যাবার/ যাবে/ যাবেন/ যেয়ে/ রইল/ রাখতে/ রাখবা/ রাখবেন/ রাখলেন/ রেখেছে/ শিখেছি/ শুকায়/ শুনে/ শোনে/ শোনেন/ হওয়া/ হচ্ছে/ হতে/ হবে/ হয়/ হয়ে/ হয়েছি/ হয়েছে/ হলেও/ হলো/ withdraw

অব্যয়

আর/ উপর/ উপরে/ এবং/ এমনকি/ কী/ কিন্তু/ কি-না/ কীভাবে/ কীসের/ জন্য/ তরে/ তা/ তাই/ তাহলে/ তো/ নাকি/ পর্যন্ত/ পর/ যদ্দূর/ যদি/ যদিও/ যাতে/ যেন/ শুধু/ সঙ্গে/ সাথে/ সেইজন্য/ হিসেবে/ হিসাবে

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যরা
ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি ১-মিনিট নীরবতায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন

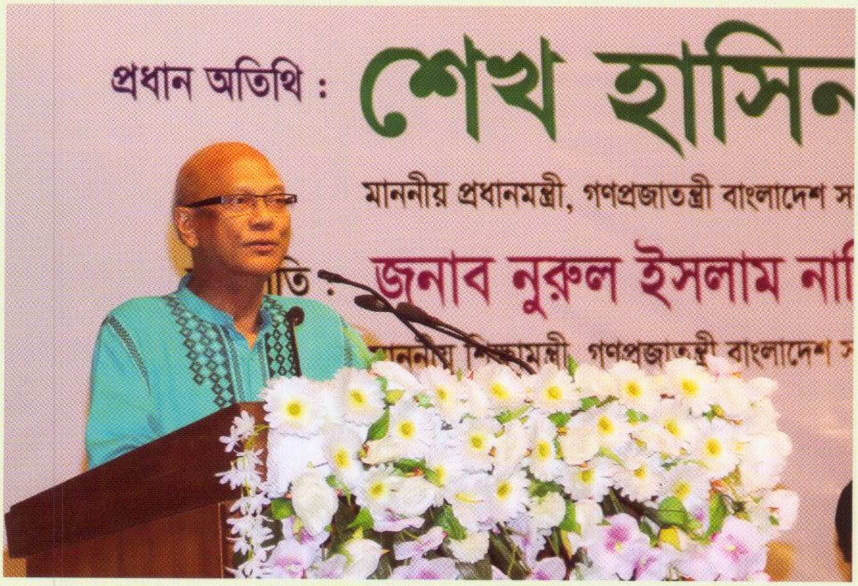

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষাসচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বিয়েট্রিস কালডুন, হেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, মহাপরিচালক, আমাই

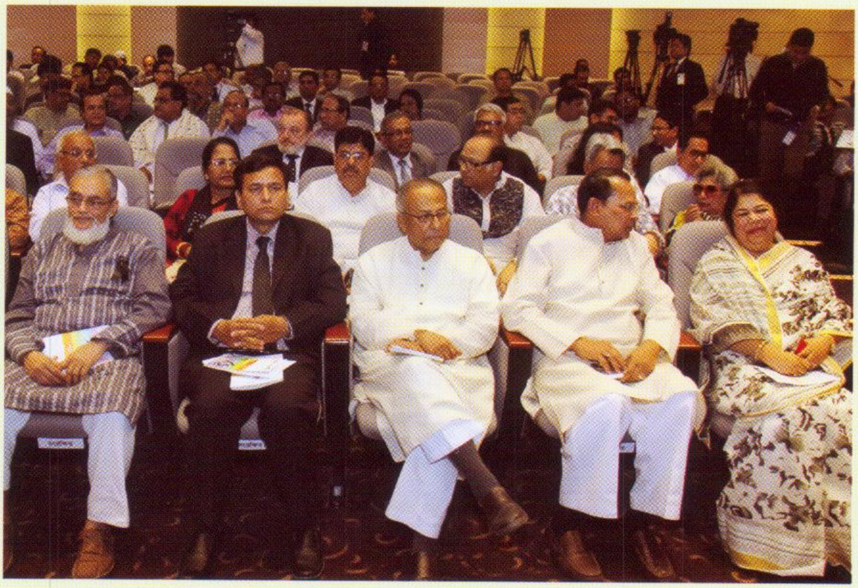

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি. ও সুধীবৃন্দ (একাংশ)

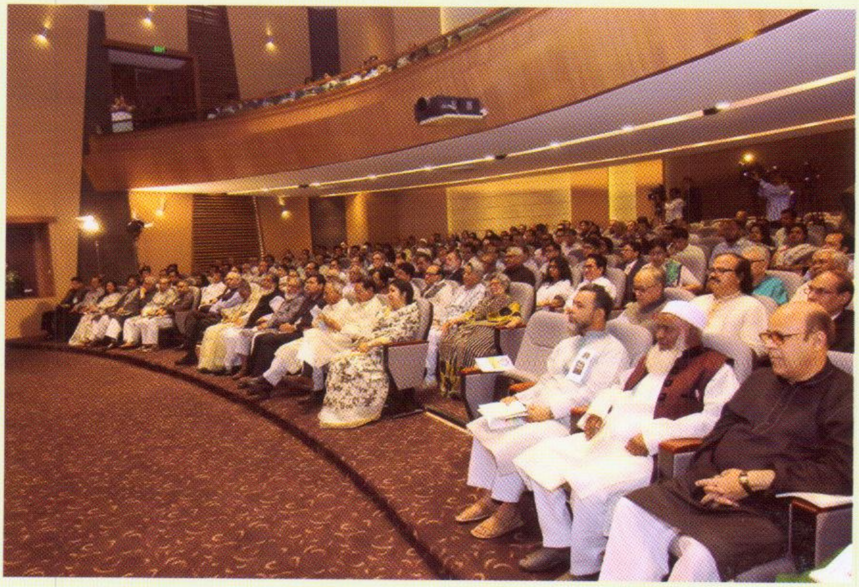

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি. ও সুধীবৃন্দ (একাংশ)

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি শিশুদের একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃতরতা রুশ দূতাবাসের জনৈক শিশুশিল্পী

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিদেশি দূতাবাসের ট্রফি হাতে শিশুশিল্পীদের সঙ্গে আমাই মহাপরিচালক

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে ঠাকুরগাঁও থেকে আগত সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর শিল্পীরা

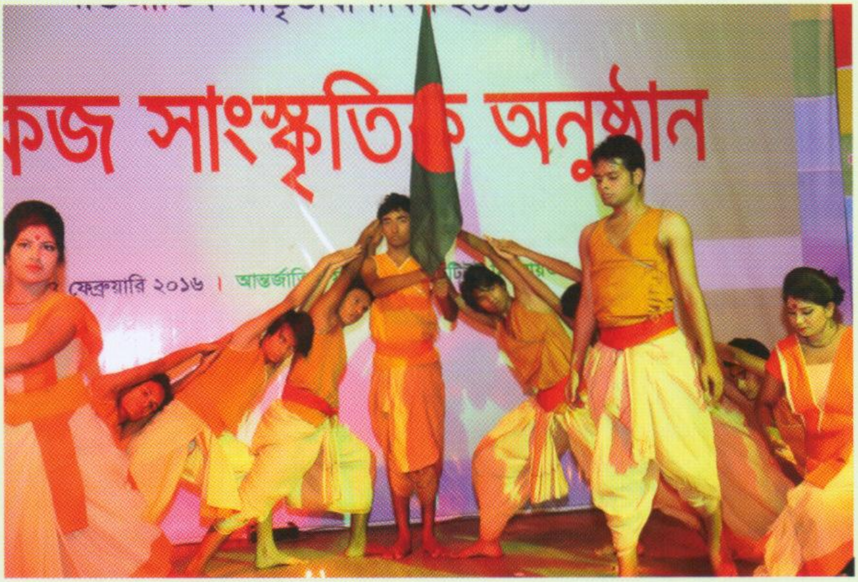

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গীতিনৃত্য *শাশ্বত বাংলা* পরিবেশন করছে গাইবান্ধা থেকে আগত ও স্থানীয় শিল্পীরা

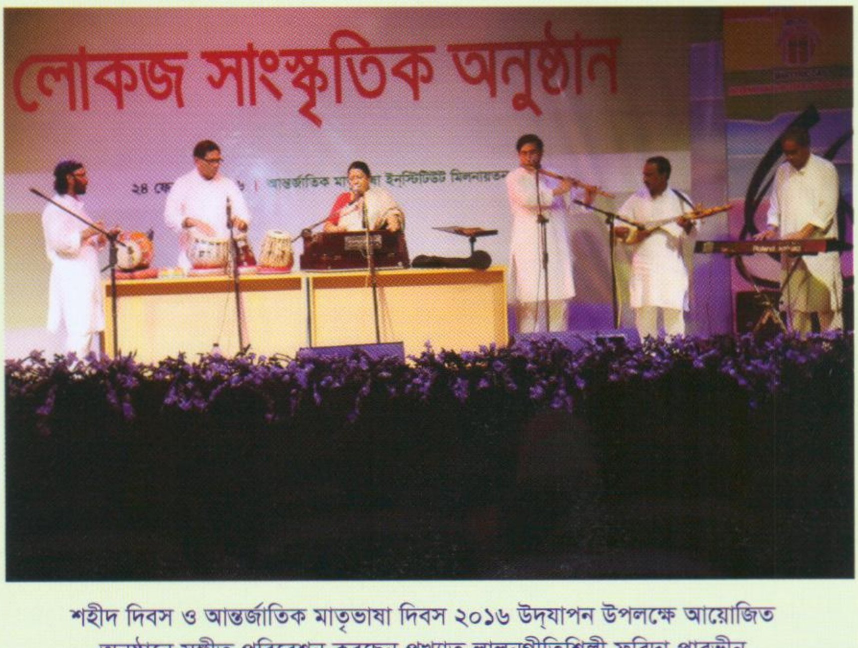

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন প্রখ্যাত লালনগীতিশিল্পী ফরিদা পারভীন

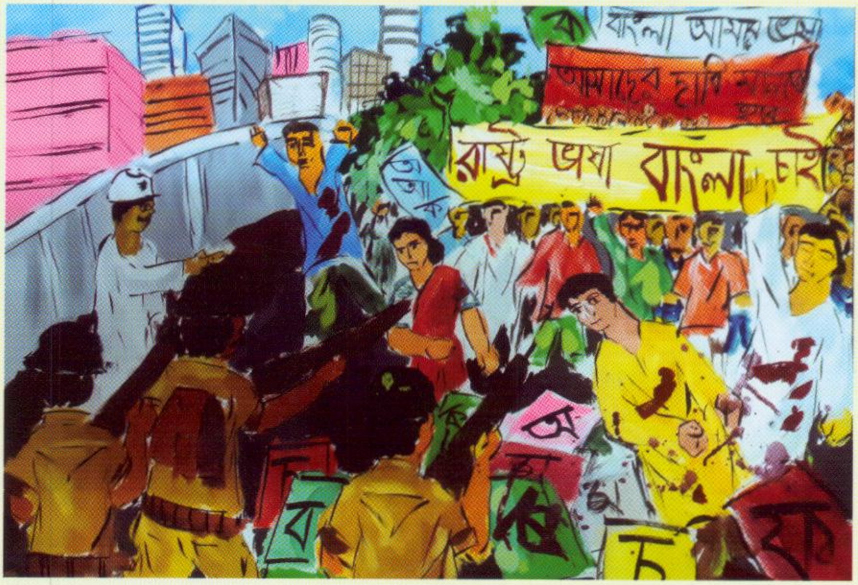

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘ গ্রুপে (৯-১০ম) প্রথম পুরস্কারজয়ী সৈয়দ গাউস আহম্মেদ গালিব, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘ গ্রুপে দ্বিতীয় পুরস্কারজয়ী নাফিসা ইসলাম তুলতুল, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের
নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন (বহির্দৃশ্য)